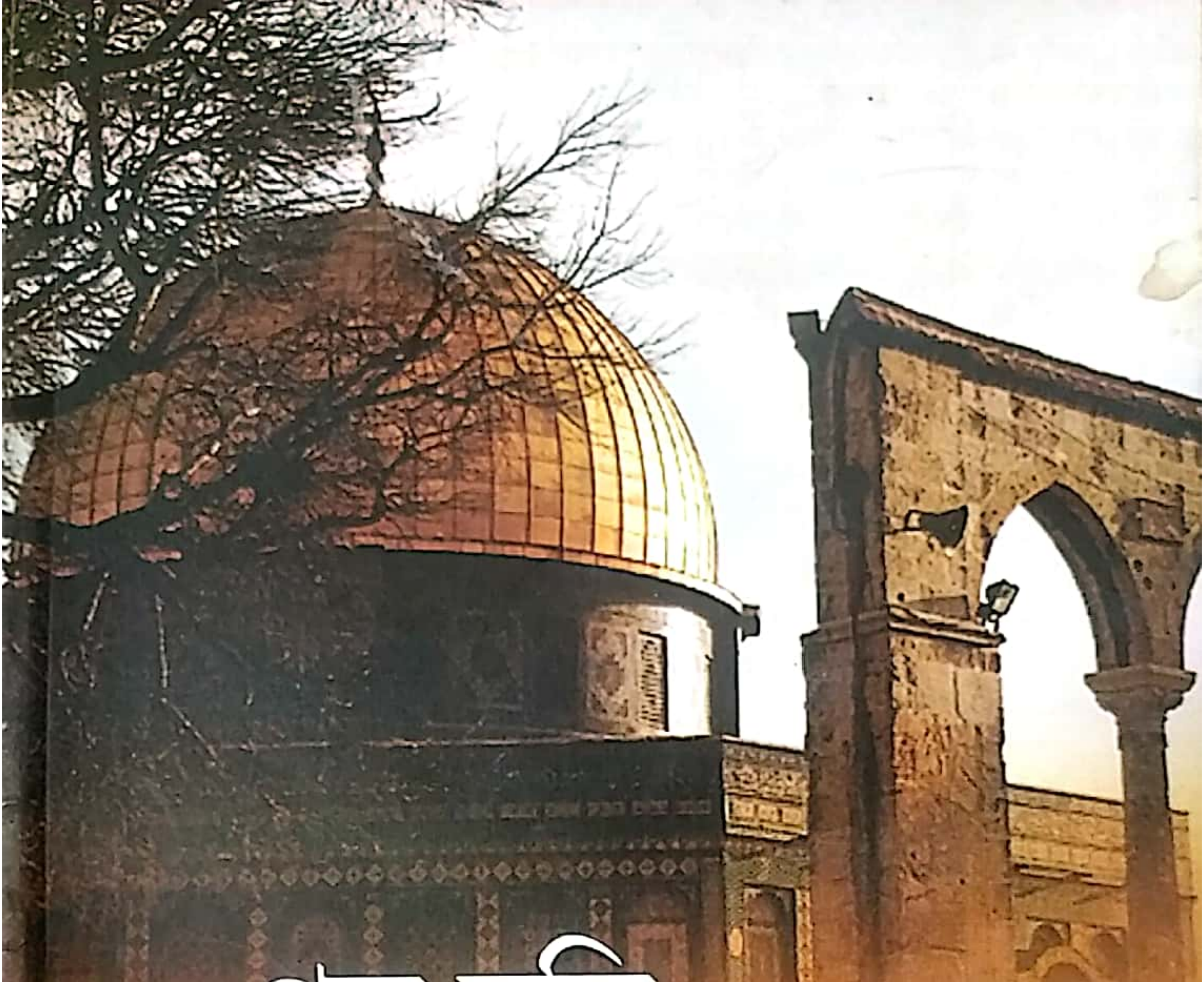

গল্প বলি ফিলিস্তিনের

হামমাদ রাগিব

Scanned by CamScanner

গল্প বলি ফিলিস্তিনের

হামমাদ রাগিব

নবপ্রকাশ
শুধু বই নয়...
ইসলামী টাওয়ার, দোকান : ২০
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল : ০১৯৭৪ ৮৮৮ ৪৪১

Scanned by CamScanner

গল্প বলি ফিলিস্তিনের

হামমাদ রাগিব

প্রকাশক : নবপ্রকাশ
প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১৮
প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ : কারুকাজ

মূল্য : ১২০ [এক শ বিশ] টাকা মাত্র
Price: BDT 120.00 | US $ 04.00

GOLPO BOLI FILISTINER
by Hammad Ragib

noboprokash.com | noboprokash@gmail.com | fb/noboprokash
E-store: rokomari.com/noboprokash
ISBN: 978-984-93471-5-6

Scanned by CamScanner

উৎসর্গ

মাওলানা শাইখ ফজলুর রহমান মৌলভীচকী।
আমার বাবা।
আমার ধারণার চেয়েও বড় একটা আকাশ। যে আকাশের নিচে নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় বসবাস করি আমরা এক পরিবার মানুষ।
হে আল্লাহ, আকাশের ছায়াকে তুমি আরও দীর্ঘায়িত করো।

Scanned by CamScanner

লেখকের বক্তব্য

গেল বছর মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক অনলাইন সংবাদমাধ্যম gulfbangla.com-এ কাজ করার সুবাদে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে নতুন করে জ্ঞানান্বেষণের সুযোগ হয়। বিশেষ করে ফিলিস্তিন নিয়ে। ফিলিস্তিন বিষয়ে আমার আগ্রহ ছোটবেলা থেকে। আল-আকসার প্রতি অদম্য এক টান যেন সারাক্ষণ আমাকে তাড়া করে ফিরত। সেই টান থেকে এ পাণ্ডুলিপির জন্ম।

ফিলিস্তিনে মুসলিমদের উত্থান-পতনের ইতিহাস গল্পে গল্পে সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করা হয়েছে বইটিতে। সেই সঙ্গে ফিলিস্তিনি কয়েকজন বীরের আত্মদানের গল্পও সংযুক্ত হয়েছে। পাঠক এক চুমুকে পুরো ফিলিস্তিনকে সংক্ষেপে পাঠ করে নিতে পারবেন, আশা করি।

কবি ও কথাসাহিত্যিক সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর বইটির আদ্যোপান্ত সম্পাদনা করেছেন। তাঁর সম্পাদনা-উত্তর মন্তব্য : বইটি কিশোরদের জন্য মানানসই। সেভাবেই ছোট কলেবরে প্রকাশ হচ্ছে বইটি।

গল্প বলি ফিলিস্তিনের আমার প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। নবীন এক লেখকের প্রথম বই যথাযথ গুরুত্ব, পেশাদারিত্ব ও আন্তরিকতার সঙ্গে প্রকাশ করার জন্য নবপ্রকাশের প্রতি অনিঃশেষ কৃতজ্ঞতা।

ভয় ও আশাবাদে দোদুল্যমান হৃদয়ে বইটি পাঠকের কাছে সমর্পণ করলাম। আপনাদের পাঠোদ্দীপনা আমাকে প্রাণিত করবে। সকল কৃতজ্ঞতা আল্লাহ তাআলার। শুভেচ্ছা।

—হামমাদ রাগিব

Scanned by CamScanner

সূচি

আল-কুদসে বিজয়ের পতাকা	০৯
সোনালি আর কালো গম্বুজের গল্প	১২
ক্রুসেডারদের দখলদারি	১৬
সালাহুদ্দিন আইয়ুবির পুনরুদ্ধার	১৯
হারানোর গল্প	২৩
চিরতরুণ সিপাহসালার	৩৩
দ্য লেডি হাইজ্যাকার	৪০
ওফা	৫১
তেজস্বিনী	৫৭
সাহসিকা হানজালা	৫৯
দ্রোহের দীপশিখা	৬৪
বেথলেহেমের দিন-রাত্রি	৬৯
অকুতোভয় প্রতিবন্ধী	৭৫

Scanned by CamScanner

আল-কুদসে বিজয়ের পতাকা

আল-কুদস। ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি। মুসলমানদের প্রাণের শহর। প্রথম কেবলার শহর। ইহুদি আর খ্রিষ্টানদের ভালোবাসাও প্রোথিত আছে এই শহরে। তিন ধর্মের তীর্থ শহর এই আল-কুদস। জেরুজালেম।

নবি দাউদ, নবি সুলায়মান আলায়হিমাস সালাম—পিতা-পুত্র দুই নবি শাসন করে গেছেন এ শহর। এ শহরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে নবি ইসা আলায়হিস সালামের কত স্মৃতি! আরও অনেক নবির পুণ্যস্মৃতি!

নবি মুহাম্মদ, আমাদের প্রিয় নবি, বিশ্বনবি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মেরাজ এই ভূমি থেকেই শুরু হয়েছিল। মেরাজ রজনীর বাহন বোরাকের পদধূলি মিশে আছে এই শহরের বালুকণায়।

ইসায়ি ৬৩৭ সাল।

জেরুজালেম তখন বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের শাসনে। বাইজেন্টাইন সরকারের প্রতিনিধি সোফ্রোনিয়াস এ শহরের শাসনকর্তা। সোফ্রোনিয়াস খ্রিষ্টানদের ধর্মযাজকও। জেরুজালেমের বাসিন্দা খ্রিষ্টধর্মের বাইরে যারা, তারা তো নির্যাতিত ছিলই, এমনকি খোদ খ্রিষ্টানরাও ছিল রাষ্ট্রীয় নিষ্পেষণের শিকার।

ইসলামি খেলাফতের খলিফা তখন হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা। আমিরুল মুমিনিন।

উমরের নির্দেশে মুসলিম সেনাপতিরা ইসলামের বিজয় নিশান উড়িয়ে চলেছেন পৃথিবীর দিকে দিকে। একের পর এক শহর পদানত হচ্ছে খেলাফতের অধীনে।

Scanned by CamScanner

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ। নবিজি যাঁর উপাধি দিয়েছেন সাইফুল্লাহ—আল্লাহর তলোয়ার। ইসলামের অজেয় বীর। মুসলমানদের সাহসী সেনাপতি। তাঁর সঙ্গে আমর ইবনে আস। আরেক সিংহশার্দূল সাহাবি। সঙ্গে সাহাবাদের যোদ্ধাদল। ইসলামের বিজয় নিশান বাইজেন্টাইনদের বিভিন্ন শহরে বীরদর্পে উড়িয়ে সবাই এসে অবরোধ করেন জেরুজালেম। আল-কুদস।

জেরুজালেমের অধিপতি সোফ্রোনিয়াসের সাহস নেই অজেয় এই বাহিনীর মোকাবিলা করার। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অন্যান্য অনেক শহর পর্যুদস্ত করে মুসলমানরা কীভাবে বিজয় ছিনিয়ে এনেছেন, সব খবর তাঁর কাছে আছে। মোকাবিলা করে এ শক্তিকে দমানো যাবে না।

সোফ্রোনিয়াস সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন। আত্মসমর্পণ করবেন তিনি। তবে শর্ত আছে।

কী শর্ত?

মুসলমানদের খলিফাকে আসতে হবে জেরুজালেমে। তাঁর কাছেই তিনি আত্মসমর্পণ করবেন। আর কারও কাছে নয়।

কিন্তু খলিফা তো এখানে নেই। দূর মদিনায় তিনি। খেলাফতের মূল ঠিকানায়।

না, তাঁকেই আসতে হবে। আত্মসমর্পণ তাঁর কাছে হবে।

দূত পাঠানো হলো মদিনায়। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ও আমর ইবনে আস দূত মারফত জানতে চাইলেন—আমিরুল মুমিনিন কি আসবেন, না অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে?

আমিরুল মুমিনিন আসবেন। তিনি বেরিয়ে পড়েছেন। একটি উটে সওয়ার হয়ে। সঙ্গে এক ভৃত্য। বেশভূষা নিতান্ত সাদামাটা এক মুসাফিরের। দেখে কারও বোঝার উপায় নেই, এই সাদামাটা মুসাফিরের অঙ্গুলিহেলনেই পরিচালিত হয় অর্ধজাহান।

তিনি এলেন। জেরুজালেমে।

সোফ্রোনিয়াস দেখে তো হতবাক। এ কেমন রাজা? কোনো শান-শওকত নেই। নেই প্রাচুর্যের জৌলুশ। দেখতে ফকিরের মতো। এই লোকের হুকুমেই তবে অর্ধজাহান পরিচালিত হয়!

Scanned by CamScanner

সোফ্রোনিয়াস খলিফা উমরকে স্বাগত জানালেন পবিত্র ভূমি আল-কুদসে। মুসলিম সেনাবাহিনী নিয়ে উমর প্রবেশ করলেন জেরুজালেম শহরে।

সোফ্রোনিয়াস আত্মসমর্পণ করলেন আমিরুল মুমিনিনের কাছে। সন্ধির চুক্তিপত্র তুলে দিলেন তাঁর হাতে। আমিরুল মুমিনিনকে ঘুরে ঘুরে দেখালেন পুরো শহর। দেখালেন জেরুজালেমে খ্রিষ্টানদের প্রধান গির্জা।

উমর যখন গির্জা পরিদর্শন করছিলেন, তখন নামাজের সময়। সোফ্রোনিয়াস আমিরুল মুমিনিনকে গির্জার ভেতরেই নামাজ আদায়ের আমন্ত্রণ জানালেন। দূরদর্শী আমিরুল মুমিনিন সোফ্রোনিয়াসকে তাঁর উদারতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, 'আমি যদি আজ এখানে নামাজ আদায় করি, তবে ভবিষ্যতে আমার নামাজের অজুহাত দেখিয়ে এই গির্জাকে মসজিদ বানানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এটা ভিন্নধর্মী জনগোষ্ঠীর অধিকার লঙ্ঘনের শামিল। ইসলাম এই অধিকার লঙ্ঘনকে সমর্থন করে না। নামাজ আমি বাইরেই আদায় করব।'

উমর গির্জা থেকে বাইরে বেরিয়ে নামাজ আদায় করলেন। মুসলমানদের খলিফার এমন দূরদর্শী চিন্তাধারা আর ভিন্ন ধর্মের মানুষের অধিকারের প্রতি সচেতনতা দেখে সোফ্রোনিয়াস অভিভূত হয়ে গেলেন। মুসলমানরা মানবাধিকারের প্রতি এমন সচেতন বলেই অর্ধজাহান তাঁদের পদানত করতে পেরেছিল। তাঁদের দিগ্বিজয়ের মূল চালিকাশক্তি কোথায়, সোফ্রোনিয়াস কিছুটা হলেও সেদিন আন্দাজ করতে পেরেছিলেন।

খলিফা উমর সেদিন গির্জা থেকে বেরিয়ে যে স্থানে নামাজ আদায় করেছিলেন, জায়গাটি কিছুদিনের ভেতর সত্যি সত্যি মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছিল। মসজিদটির নাম মসজিদে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু। আল-কুদসের বুকে সেটা আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফার দূরদর্শিতার নীরব সাক্ষী হয়ে।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে সেদিন সোফ্রোনিয়াসের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে ফিলিস্তিন সর্বপ্রথম মুসলমানদের করতলগত হয়। তখন থেকেই ফিলিস্তিনের আকাশে পতপত করে উড়তে থাকে ইসলামের পতাকা। হেলালি নিশান।

Scanned by CamScanner

সোনালি আর কালো গম্বুজ

মসজিদুল আকসা।

মেরাজ রজনীতে মক্কা থেকে বোরাকে চড়ে নবিজি এখানেই এসেছিলেন প্রথমে। সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। এখানে পূর্ববর্তী নবিদের নিয়ে দুই রাকাত নামাজ আদায় করে রওনা হয়েছিলেন আকাশপানে।

অসংখ্য নবি-রাসুলের পদধূলির সঙ্গে আমাদের প্রিয় নবির পদধূলিও মিশে আছে আকসার আঙিনায়। মিশে আছে মেরাজ রজনীর পবিত্র স্মৃতি।

১৪ লাখ ৪০ হাজার বর্গমিটারজুড়ে মসজিদুল আকসার চৌহদ্দি। চৌহদ্দির ভেতরের পুরো অংশটাই হারাম শরিফ। পবিত্র ভূমি। এর যেকোনো জায়গায় এক রাকাত নামাজ আদায় করা হাজার রাকাতের সমতুল্য।

মসজিদুল আকসা কমপ্লেক্সটি চতুর্দিক থেকে দেয়ালবেষ্টিত। এর ভেতরে অনেক স্থাপনা আছে। আছে স্বতন্ত্র দুটি মসজিদ। গম্বুজওয়ালা। একটির গম্বুজ সোনালি আরেকটির কালো।

ছবিতে সোনালি গম্বুজের মসজিদটি দেখে আমরা মনে করি ওটাই বোধ হয় মসজিদুল আকসা। আবার কেউ কেউ ভাবি, কালো গম্বুজওয়ালাটির কথা—ওটাই মসজিদুল আকসা।

Scanned by CamScanner

আসলে দুটিই আকসার আলাদা আলাদা অংশ। সোনালি গম্বুজওয়ালাটির নাম কুব্বাতুস সাখরা বা ডোম অব দ্য রক। আর কালো গম্বুজওয়ালাটি আল-জামিউল কিবালি।

তবে আল-জামিউল কিবালির আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। এটা নির্মাণ করেছিলেন হজরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু। আকসা কমপ্লেক্সের মূল মসজিদ হিসেবে এটাকেই গণ্য করা হয়।

৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দ।

মুসলিমরা ফিলিস্তিন জয় করেছেন। আমিরুল মুমিনিন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এসেছেন জেরুজালেমে। পবিত্র নগরী তিনি ঘুরে ঘুরে দেখছেন। দেখে দেখে চোখ জুড়াচ্ছেন নবি-রাসুলদের স্মৃতিধন্য শহর।

মসজিদুল আকসায় এসে তিনি থামলেন। বিশাল আঙিনা। আহা, এই আঙিনায়ই তো কত নবি-রাসুলের পদচিহ্ন মিশে আছে। মিশে আছে নবি মুহাম্মদের মেরাজ রজনীর স্মৃতি। এই তো হায়েতুল বোরাক! এই দেয়ালেই তো নবিজি তাঁর মেরাজ রজনীর সওয়ারি বোরাক বেঁধে রেখেছিলেন।

সাখরা পাথরটা কোথায়? যে পাথরটার দিকে মুখ করে সাহাবিদের নিয়ে নবিজি ১৬ মাস নামাজ আদায় করেছিলেন।

পাথরটা পাওয়া গেল ময়লা-আবর্জনার স্তূপের নিচে। খ্রিষ্টানরা এখানে এত দিন ময়লা ফেলেছে। ইহুদিদের প্রতি হিংসাপরাছু হয়ে তারা এ কাজটা করেছে।

ফিলিস্তিনি খ্রিষ্টানদের দুই চোখের দুশমন ছিল ইহুদিরা। কলহপ্রিয় এই ইহুদিরা কোনো কালেই ভালো ছিল না। কেউ দেখতে পারত না এদের। মারও খেয়েছে ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে।

'সাখরা' অর্থ পাথরখণ্ড। পাথরখণ্ডটি ছিল ইহুদিদের সম্মানের জিনিস। এটাকে মূল বিন্দু ধরেই মূলত কিবলা নির্ধারিত হতো। ইহুদিরা এখনো এটাকে কিবলা মানে। এদিকে ফিরে তাদের সব উপাসনা-আরাধনা অনুষ্ঠিত হয়।

Scanned by CamScanner

খ্রিষ্টানরা এ জন্যই এটাকে ময়লা-আবর্জনা দিয়ে ঢেকে রেখেছিল। উদ্দেশ্য—ইহুদিদের অপমান করা।

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু সাখরা পাথরটার ওপর থেকে ময়লা-আবর্জনা সরানোর নির্দেশ দিলেন। নিজেও লেগে গেলেন পবিত্র পাথরটা পরিষ্কার করার কাজে।

আকসা কমপ্লেক্সের ভেতর একটা মসজিদ নির্মাণের কথা ভাবলেন খলিফা। কোথায় কীভাবে করা যায়—সঙ্গীদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। সঙ্গীদের একজন ছিলেন কাবে আহবার। তিনি নও-মুসলিম। ইসলাম গ্রহণের আগে ইহুদিদের বড় পণ্ডিত ছিলেন।

আহবার পরামর্শ দিলেন মসজিদটি সাখরা পাথরের উত্তর পাশে নির্মাণ করার জন্য। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মুচকি হাসলেন তাঁর পরামর্শ শুনে। বললেন, 'আহবার, তোমার মধ্যে ইহুদিবাদের গন্ধ রয়ে গেছে। পূর্বের ধর্মের রীতি-নীতির প্রতি এখনো তুমি দুর্বল।'

জেরুজালেম থেকে কাবা শরিফ দক্ষিণ দিকে। সেখানকার কিবলাও তাই দক্ষিণ। আহবারের কথামতো যদি সাখরার উত্তর পাশে মসজিদ নির্মাণ করা হয়, তাহলে নামাজের সময় সাখরাও কিবলা হয়ে যায়। কাব এ পরামর্শ দিয়ে চেয়েছিলেন তাঁর পূর্বের ধর্মের কিবলাটাও অন্তত এ মসজিদের ক্ষেত্রে ঠিক থাকুক। কিন্তু বিচক্ষণ উমর কাবের সূক্ষ্ম এ চালটা ধরে ফেলেন। কাব লজ্জিত হন। নও-মুসলিম হওয়ার কারণে পূর্বের ধর্মের প্রতি কিছুটা ভালোবাসা রয়ে গিয়েছিল তাঁর মনে। উমরের কথা শুনে তিনি সে ভালোবাসা ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে নেন।

উমর নির্দেশ দিলেন সাখরার সামনে, অর্থাৎ দক্ষিণ পাশটায় মসজিদ নির্মাণ করতে। তাহলে নামাজের সময় সাখরাটা আর মুসল্লিদের সামনে পড়বে না। পেছনে থাকবে।

উমরের নির্দেশে দ্রুত মসজিদ নির্মিত হলো। তিনি তা উদ্বোধন করলেন। এটাই আজকের কালো গম্বুজওয়ালা মসজিদ আল-জামিউল কিবালি।

মসজিদুল আকসার নামাজ তারপর থেকে এখানেই অনুষ্ঠিত হয়।

Scanned by CamScanner

কুব্বাতুস সাখরা মসজিদটি নির্মিত হয় আরও অনেক পরে। এর অবস্থান মূল সাখরা পাথরটি যেখানে আছে, সেখানে। বহুকাল এখানে কোনো স্থাপনা ছিল না। পঞ্চম উমাইয়া খলিফা আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের শাসনামলে সাখরাকে কেন্দ্র করে মসজিদটি নির্মিত হয়।

আল-আকসা কমপ্লেক্সের এ জায়গাটি ইহুদিদের কাছে খুব সম্মানিত। কারণ, তাদের কিবলা সাখরা পাথরটা এ মসজিদের ভেতরেই আছে। মুসলমানদের কাছেও তা গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান। কারণ, ঐতিহাসিকদের মতে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মেরাজ রজনীতে এখান থেকেই ঊর্ধ্বাকাশে রওনা হয়েছিলেন।

Scanned by CamScanner

ক্রুসেডারদের দখলদারি

দশম শতাব্দীর একদম শেষ দিককার কথা। মুসলিম বীর সিপাহসালারগণ এশিয়ার প্রায় অর্ধেক ভূমি করতলগত করে তত দিনে ইউরোপেও নিজেদের শাসন বিস্তৃত করেছেন। অধিকৃত প্রতিটি অঞ্চলেই গড়ে উঠেছে ইসলামি সভ্যতা-সংস্কৃতির বিপুল চর্চাকেন্দ্র।

ইউরোপের নেতৃস্থানীয় খ্রিষ্টানরা, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শাসনের নামে শোষণ করছিল সেখানকার নিরীহ জনগণকে, মুসলমানদের হাতে নিজেদের রাজ্য ও নেতৃত্ব হারিয়ে সবাই তখন অনেকটা দিশাহারা। সবার ভেতরই একটা আক্রোশ আর ক্রোধ দানা বাঁধছে সঙ্গোপনে।

এ সময়কালে ইউরোপের এই খ্রিষ্টানশক্তি একজোট হতে শুরু করল। মুসলমানদের হাত থেকে খ্রিষ্টানদের হারানো ভূমিগুলো পুনরুদ্ধার করতে হবে। এ জন্য যত ঘৃণ্য, হীন আর নৃশংস পথই অবলম্বন করতে হয়, তারা করবে। ক্রুশের ওপর হাত ছুঁয়ে সবাই শপথ নিল। প্রতিহিংসার এ লড়াইকে তারা নাম দিল ধর্মযুদ্ধ। ক্রুসেড।

সম্মুখসমরে লড়াই করে কোনো কালেই মুসলমানদের পরাজিত করা যাবে না—এ তারা অনেক আগেই বুঝে গেছে। মুসলমানদের শৌর্যবীর্য আল্লাহপ্রদত্ত। এ শৌর্যবীর্য নষ্ট করার একমাত্র পথ তাঁদের চারিত্রিক অধঃপতন ঘটানো। আরাম আর আয়েশের জিন্দেগির প্রতি আকৃষ্ট করার পাশাপাশি পারস্পরিক দ্বন্দ্ব তৈরি।

Scanned by CamScanner

খ্রিষ্টানদের সম্মিলিত জোট এ পথটাই বেছে নিল। একদল চৌকস গুপ্তচর পাঠিয়ে দিল প্রতিটি মুসলিম রাজ্যে। গুপ্তচরদের কল্যাণে মুসলিম আমির-ওমারার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল নর্তকী, সুন্দরী নারী, মদ্যপান আর অশ্লীলতা। আমির-ওমারাগণ ধীরে ধীরে জড়িয়ে গেলেন খ্রিষ্টানদের পাতানো এ ফাঁদে। সেই সঙ্গে শুরু হলো এক মুসলিম রাজ্যের সঙ্গে আরেক মুসলিম রাজ্যের দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ।

মুসলিম শাসকবর্গ আরাম-আয়েশ আর ভাইয়ে ভাইয়ে শত্রুতা-বিদ্বেষে ব্যস্ত। এই তো সুযোগ! হারানো ভূমিগুলো পুনরুদ্ধারের এই তো মোক্ষম সময়! খ্রিষ্টানরা প্রথমেই চাইল বায়তুল মুকাদ্দাস দখল করতে।

১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি। ক্রুসেডারদের সম্মিলিত শক্তি পবিত্র ভূমি জেরুজালেমে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে যাত্রা শুরু করে। জেরুজালেমের আশপাশের মুসলিম শাসক কেউই তাদের বাধা দিতে এগিয়ে আসেননি। সবাই তখন আমোদ-ফুর্তি আর নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহে ব্যস্ত। প্রতিরোধ তো দূরের কথা, অনেক শাসক লাজ-শরম সব ভুলে গিয়ে খ্রিষ্টান-শক্তিকে উল্টো আরও সহযোগিতা করে আগ বেড়ে।

এসব শাসকের মধ্যে কেবল একজন ছিলেন সিংহশার্দূল ঈমানদার। আল-কুদসের পার্শ্ববর্তী আক্রা শহরের শাসনকর্তা তিনি। সম্মিলিত খ্রিষ্টান বাহিনী আক্রা হয়েই বায়তুল মুকাদ্দাস আক্রমণের সংকল্প করেছিল। তিনি খ্রিষ্টানদের এ স্পর্ধা সহ্য করতে পারলেন না। প্রতিবাদ করলেন। রুখে দাঁড়ালেন খ্রিষ্টানদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। কিন্তু তাদের সম্মিলিত বিশাল সেনাবাহিনীর বিপরীতে তাঁর সৈন্যসংখ্যা নিতান্তই হাতে গোনা। তারপরও তিনি পিছু হটেননি। আল্লাহর ওপর ভরসা করে দাঁড়িয়ে যান পবিত্র বায়তুল মুকাদ্দাস রক্ষা করার জন্য। কিছুতেই তিনি এ পথে বায়তুল মুকাদ্দাস আক্রমণ করতে দেবেন না।

১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি ক্রুসেডাররা আক্রা অবরোধ করে। ১৩ মে অবধি টানা তিন মাস অবরোধ করে রাখে। কিন্তু আক্রার মুসলমানরা প্রাণপণে লড়ে খ্রিষ্টান বাহিনীকে আক্রা প্রবেশ থেকে দমিয়ে রাখে। উপায়ান্তর না দেখে খ্রিষ্টানরা পথ পরিবর্তন করে অন্য পথে হামলা চালায় পবিত্র ভূমি আল-কুদসের ওপর।

Scanned by CamScanner

১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জুন ক্রুসেডাররা আল-কুদস অবরোধ করে। আল-কুদসের শাসনকর্তা তখন ইফতেখারুদ্দৌলা। তাঁর সৈন্যসংখ্যা খ্রিষ্টানদের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। পঙ্গপালসদৃশ খ্রিষ্টান বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে তিনি পার্শ্ববর্তী ভ্রাতৃপ্রতিম মুসলিম রাজ্যগুলোর কাছে সাহায্য চাইলেন। কিন্তু পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোর আমির-ওমারারা তখন খ্রিষ্টান বাহিনীর রসদ জোগাতেই ব্যস্ত! ইফতেখারুদ্দৌলাকে তাঁরা সাহায্য করবেন কীভাবে!

সবার কাছ থেকে নিরাশ হয়ে ইফতেখারুদ্দৌলা ক্ষুণ্ন মনে এক আল্লাহর ওপর ভরসা করে নিজের যা আছে তা-ই নিয়ে প্রতিরোধ করতে লাগলেন খ্রিষ্টান বাহিনীর। শেষতক আর পেরে উঠতে পারলেন না। ১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ জুলাই ইফতেখারুদ্দৌলার সকল প্রতিরোধব্যূহ চূর্ণ করে ক্রুসেডাররা হাজার নবির স্মৃতিধন্য পবিত্র আল-কুদস শহরে অনুপ্রবেশ করে।

আল-কুদস শহরে নেমে এল কিয়ামতের ভয়াবহতা। ক্রুসেডাররা মুসলিম পুরুষদের ঘর থেকে বের করে এনে জবাই করতে থাকে এক-এক করে। নারীদের ওপর চালায় পাশবিক নির্যাতন। বাদ পড়েনি নিষ্পাপ শিশুরাও।

নিরস্ত্র অসহায় মুসলিমরা মসজিদুল আকসায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। আকসা তো মুসলমানদের কাছে যেমন পবিত্র, খ্রিষ্টানদের কাছেও তেমনি সম্মানিত স্থান। এখানে রক্ত ঝরানো দুই ধর্মেই পাপ। মুসলিমরা মনে করেছিল, মসজিদে আকসায় আশ্রয় নিলে হয়তো রেহাই পাওয়া যাবে। খ্রিষ্টানরা অন্তত প্রাণে মারবে না সেখানে। কিন্তু উন্মত্ত সৈন্যরা সেখানে গিয়েও মুসলমানদের নৃশংসভাবে জবাই করতে থাকে। মুসলিমদের তাজা খুন মসজিদ গড়িয়ে পাশের রাস্তায় এসে পড়ে। রাস্তায় চলমান খ্রিষ্টানদের ঘোড়ার পা পর্যন্ত ডুবে গিয়েছিল বহমান এ রক্তে।

এভাবেই খলিফা উমরের বিজয় করা ফিলিস্তিনে ক্রুসেডারদের অনুপ্রবেশে অবনমিত হয়ে যায় দীর্ঘ চার শতাব্দী ধরে পতপত করে উড়তে থাকা বিজয় পতাকা। আর মুসলমানরা হয় চরম নৃশংসতা ও বঞ্চনার শিকার।

Scanned by CamScanner

সালাহুদ্দিন আইয়ুবির পুনরুদ্ধার

জেরুজালেম তখন খ্রিষ্টানদের দখলে। মসজিদে আকসাকে ইতিমধ্যেই তারা গির্জায় রূপান্তরিত করেছে। দীর্ঘ চার শতাব্দী ধরে যে মসজিদের আজান শুনে আল-কুদসের জনগণের ঘুম ভাঙত, সেখানে এখন ঢনঢন করে বাজে গির্জার ঘণ্টা। মুসলিম বিশ্বের প্রতিটা ঈমানদারের হৃদয়ে এ ব্যথা চিনচিন করে প্রতিটা মুহূর্ত।

বাগদাদ শহরে এমনই এক ঈমানদার কাঠমিস্ত্রি ছিলেন। মসজিদে আকসা হারানোর বেদনা যাঁকে তাড়া করে ফিরত প্রতিনিয়ত। একবার তিনি মনের মাধুরী মিশিয়ে খুব যত্ন করে ফুল তুলে একটা মিম্বর বানালেন। মিম্বরটির সৌন্দর্যের খ্যাতি তামাম বাগদাদ নগরীতে চাউর হয়ে গেল।

দলে দলে লোকজন আসতে লাগল মিম্বরটি দেখার জন্য। ধনকুবের অনেকেই চড়া মূল্যে কিনতে চাইলেন, কিন্তু মিস্ত্রির সাফ জবাব—না, এ মিম্বর বিক্রির জন্য নয়।

তবে বাগদাদের কোনো মসজিদে দান করে দাও!

না, তা-ও করব না।

কেন কেন? বিক্রিও করবে না, কোনো মসজিদে দানও করবে না, তো এ মিম্বর বানিয়েছ কী জন্যে?

এ মিম্বর মসজিদে আকসার জন্য বানিয়েছি। আল্লাহ চাহে তো এটা একদিন আল-আকসায় স্থাপিত হবে।

Scanned by CamScanner

কাঠমিস্ত্রির আজগুবি এ বাসনার কথা শুনে সবাই হাসাহাসি করে। আল-আকসা তো খ্রিষ্টানদের দখলে। খ্রিষ্টানরা যেভাবে শক্তপোক্ত হয়ে বসেছে সেখানে, অদূর ভবিষ্যতে তা মুসলমানদের করতলগত হওয়া আকাশকুসুম কল্পনা বৈ কিছু নয়। অথচ এ কাঠমিস্ত্রি বলে কী! তার বানানো মিম্বর নাকি আল-আকসায় নিয়ে স্থাপন করবে!

মানুষের হাসি-তামাশাকে থোড়াই কেয়ার করে কাঠমিস্ত্রি তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর অটল থাকেন। সৌন্দর্যমণ্ডিত মিম্বরটি তিনি কারও কাছে বিক্রি করেন না, কোনো মসজিদেও স্থাপন করেন না।

একদিন একটি বাচ্চাছেলে তার বাবার হাত ধরে এল মিম্বরটি দেখার জন্য। মিম্বর দেখতে এসে এর নির্মাতা কাঠমিস্ত্রির পবিত্র সেই ইচ্ছার কথা শুনে সে মনে মনে সেদিনই প্রতিজ্ঞা করল, এ স্বপ্ন যেকোনো উপায়ে পূরণ করতে হবে। বড় হয়ে একজন দক্ষ সিপাহসালার হতে হবে। তারপর পুনরুদ্ধার করতে হবে পবিত্র ঘর মসজিদুল আকসা।

হ্যাঁ, কাঠমিস্ত্রির মিম্বর দেখতে যাওয়া সেদিনের সেই ছোট্ট বালকটিই পরবর্তীকালে আল-কুদস পুনরুদ্ধার করেছিল খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের জবরদখল থেকে। কাঠমিস্ত্রির সেই স্বপ্নও সে পূরণ করেছিল। সৌন্দর্যমণ্ডিত মিম্বরটি এনে স্থাপন করেছিল আল-আকসার মেহরাবে। বালকটি আর কেউ নন, ইতিহাসের বিখ্যাত মুসলিম বীর সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি। গ্রেট সালাদিন।

সালাহুদ্দিন আইয়ুবি তখন আব্বাসি খেলাফত কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত দামেস্কের সুলতান। নিজ কর্মদক্ষতা, বীরত্ব, বাহাদুরি আর একনিষ্ঠতা তাঁকে এত দূর নিয়ে এসেছে। খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের কাছে ছিলেন তিনি সাক্ষাৎ এক মৃত্যুদূত।

১১৭৫ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি দামেস্কের সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে বসার প্রায় এক যুগ কাল অবধি অভ্যন্তরীণ শক্তির উৎপাতের কারণে আল-কুদস পুনরুদ্ধারে খুব একটা মনোযোগী হতে পারেননি। এই সময়টাতে তিনি মুসলিম নামধারী আরামপ্রিয় গাদ্দার

Scanned by CamScanner

আমির-ওমারাদের কখনো বুঝিয়ে কখনো যুদ্ধের মাধ্যমে নিজের আনুগত্যে আনেন।

১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পূর্ণ মনোযোগ দেন পবিত্র ভূমি আল-কুদসের পুনরুদ্ধারে। ২০ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ৫৮৩ হিজরির ১৫ রজব রোববার নিজ নেতৃত্বে মুসলিম মুজাহিদদের বিশাল এক কাফেলা নিয়ে অবরোধ করেন আল-কুদস।

আল-কুদস খ্রিষ্টানদেরও পবিত্র ভূমি। জীবন দিয়ে হলেও এ ভূমি তারা নিজেদের করায়ত্তে রাখতে চায়। শুরু হলো রক্তক্ষয়ী লড়াই। মরণপণ লড়াই করছে উভয় পক্ষই। কিন্তু সালাহুদ্দিন আইয়ুবির জানবাজ মুজাহিদদের মোকাবিলায় খুব বেশি দিন ঠিকল না ক্রুসেডারদের এ বীরত্ব।

অবরোধের ১২তম দিন ২ অক্টোবর মোতাবেক ২৭ রজব শহরের সব প্রতিরোধব্যূহ ভেঙে পড়ল। মুসলিম যোদ্ধারা আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে প্রবেশ করলেন পুণ্যভূমি আল-কুদসে। প্রবেশ করলেন দীর্ঘ প্রায় ৯০ বছর পর। এ ৯০ বছর এখানে একটি বারের জন্যও আল্লাহু আকবারের ধ্বনি উচ্চারিত হতে দেয়নি খ্রিষ্টান ক্রুসেডাররা। মুসলিমরা ছিল এখানে চরম নিষ্পেষণের শিকার। যারাই ইসলামের নাম মুখে এনেছে, তারাই নিক্ষিপ্ত হয়েছে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে, শিকার হয়েছে সীমাহীন নির্যাতনের।

কিন্তু আজ, এই বিজয়ের দিন, আল-কুদসের সর্বময় ক্ষমতা পেয়ে মুসলিমরা কী করলেন? ৯০ বছর আগে যেভাবে খ্রিষ্টানরা গণহত্যা চালিয়েছিল নিরীহ মুসলমানদের ওপর, তার প্রতিশোধ নিলেন? খ্রিষ্টানদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে তাদের জবাই করলেন? না, এর কোনোটিই করেননি। কেবল যারা যুদ্ধাপরাধী, তাদের বিচার করলেন। যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে যারা জড়িত ছিল না, যারা নিরীহ খ্রিষ্টান, তাদের রাষ্ট্রীয় কর আদায়ের শর্তে নিরুপদ্রবে বেঁচে থাকার অধিকার দিলেন। তাদের গায়ে ফুলের আঁচড়টিও লাগতে দিলেন না।

Scanned by CamScanner

এটাই মানবতা। এই মানবতাই শিক্ষা দেয় ইসলাম। এই মানবতারই প্রচার করে গেছেন ইসলামের নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবির ঐতিহাসিক এ বিজয়ের পর ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দ অবধি একাধারে এখানে শাসন করেছেন মুসলিমরা। ১৯১৭ সালের পর থেকেই এ অঞ্চলের মুসলমানদের ওপর আপতিত বর্তমান জিল্লতি আর জুলুমের সূচনা হয়।

Scanned by CamScanner

হারানোর গল্প

ষড়যন্ত্রের সূচনা বিশ শতকের শেষার্ধে।

আল-কুদসসহ ফিলিস্তিন ভূখণ্ড তখন উসমানি খেলাফতের শাসনাধীন। যদিও খেলাফতের দাপট নিভু নিভু, তারপরও তো খেলাফত! মুসলিম শক্তি। ফিলিস্তিনিদের জীবনমান বেশ উন্নত ও সমৃদ্ধ। সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী আরব মুসলিম আর কিছু খ্রিষ্টান। ইহুদিদের সংখ্যা সাকুল্যে শতকরা চার ভাগ।

ধূর্ততা, শঠতা আর বেইমানির কারণে ইহুদিদের স্থায়ী নিবাস হতো না কোথাও। ছলচাতুরীর কারণে যেখানেই গেছে, মার খেয়েছে।

যাযাবরের জিন্দেগি ছিল তাদের। এ স্থানে কত দিন তো ও স্থানে কত দিন, এভাবেই ছিল তাদের জীবনযাত্রা।

মার খেয়ে খেয়েই তারা স্বপ্ন দেখত একটি নিজস্ব ভূখণ্ডের। যেখানে নীরবে, নির্বিঘ্নে ধূর্ততা আর শঠতার চর্চা করতে পারবে। অশান্তির আগুন কীভাবে জ্বালিয়ে রাখা যায় পুরো দুনিয়ায়, ঠান্ডা মাথায় বসে সে ষড়যন্ত্রের ছক আঁকতে পারবে।

ইহুদিরা স্বপ্ন দেখল জেরুজালেম নিয়ে। মুসলমানদের ভালোবাসার আল-কুদস। ফিলিস্তিন। হ্যাঁ, ফিলিস্তিনেই হবে তাদের স্বপ্নের সেই প্রতিশ্রুত ভূমি।

শুরু হলো স্বপ্নপূরণের মিশন। ফিলিস্তিনে তারা রাষ্ট্র গড়বে, কিন্তু এখানে তাদের লোক কই? পুরো ফিলিস্তিনে সাকুল্যে কয়েক হাজার ইহুদির বসবাস।

Scanned by CamScanner

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন শেষ। ব্রিটেনের মিত্রশক্তির বিপরীত জোটে ছিল উসমানি খেলাফত। ব্রিটেনের জোটের কাছে তাদের পতন হয়েছে। ফিলিস্তিন থেকে গুটিয়ে ফেলতে হয়েছে হাজার বছর ধরে চলে আসা মুসলিম শাসনের হাত।

১৯১৯ সাল। উসমানি খেলাফতের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে ফিলিস্তিনের মাটি থেকে। পবিত্র আল-কুদসের অলিগলিতে এখন তুর্কি সৈনিকদের পরিবর্তে ব্রিটিশ সৈনিকদের দাম্ভিক পদচারণ। ফিলিস্তিন এখন ব্রিটিশ শাসনের অধীন। খ্রিষ্টানদের উপনিবেশ।

১৯১৪ সালে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধে, ব্রিটিশ সৈন্যরা ফিলিস্তিনে এসেছিল উসমানি খেলাফতের কর্তৃত্ব থেকে ফিলিস্তিনিদের রক্ষা করতে। হ্যাঁ, রক্ষা করতে। আরব জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ফিলিস্তিনিরাই তাদের স্বাগত জানিয়েছিল।

উসমানিদের শাসন তখন তাদের মনে হয়েছিল ভিনদেশিদের শাসন। কারণ, উসমানিরা তুর্কি আর তারা আরব। ভিনদেশিরা কেন আমাদের শাসন করবে? আমরা স্বাধীনতা চাই। আমরাই আমাদের দেশ শাসন করব।

ইসলামের মূল শিক্ষাটা তারা ভুলে গিয়েছিল। ভুলে গিয়েছিল মুসলিম ভ্রাতৃত্বের সৌন্দর্য। (নাকি কৌশলে তাদের ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল?)

তুর্কি হলেও ওরা তো মুসলিম। মুসলিম মুসলিমের ভাই। ভাই আবার ভিনদেশি হয় কীভাবে?

কিন্তু জাতীয়তাবাদের ভূত তাদের মাথায় এতই শক্ত হয়ে আসন গেড়েছিল যে এসব ভাবার মতো বোধশক্তিটুকুও তাদের ছিল না।

যুদ্ধ তো শেষ। তুর্কি সৈন্যরা চলে গেছে ফিলিস্তিন ছেড়ে। ব্রিটিশদের কাজ শেষ। তাদের এবার চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু না, তারা যাবে না! এই অঞ্চলে শান্তি (!) প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের আরও কিছুদিন থাকতে হবে।

Scanned by CamScanner

আরব জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ফিলিস্তিনিরা তবুও খুশি। দেরি হোক, তবু তারা তো একটি স্বাধীন ভূখণ্ড পাবে। যেখানে তুর্কিদের কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না। নিজেরাই নিজেদের শাসন করবে।

১৯১৭ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড বেলফোর একটি ঘোষণা দেন। ইতিহাস যেটাকে বেলফোর-ঘোষণা নামে স্মরণ রেখেছে।

ঘোষণাটিতে তিনি ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শপথ করেন। এটা ছিল ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে একটি ধোঁকা। কারণ, জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ফিলিস্তিনিদের বাইরে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা মনেপ্রাণে চাইতেন উসমানি খেলাফতের অধীনেই থাকুক আল-কুদস আর ফিলিস্তিন। তাঁরা কোনোভাবেই ব্রিটিশদের পদচারণ এই মাটিতে সইতে পারছিলেন না। ব্রিটিশবিরোধী এসব ফিলিস্তিনির সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যেই ছিল তাঁর এ ঘোষণা।

নিজেদের স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা শুনে এসব ফিলিস্তিনি পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু এর পেছনে যে বেলফোরের অসৎ ও ধূর্ত একটি উদ্দেশ্য ছিল, তারা টেরই পাননি। টের পেলেন যুদ্ধ যখন শেষ হলো, তখন।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দেখা গেল ফিলিস্তিনের মাটিতে দলে দলে ইহুদিরা এসে ঘরবাড়ি নির্মাণ করছে। জাহাজ বোঝাই করে ইহুদিরা আসছে ইউরোপ থেকে। তাদের পৃষ্ঠপোষকতা আর পুনর্বাসনের কাজে সার্বিক সহযোগিতা করছে ফিলিস্তিনের ব্রিটিশ প্রশাসন।

ইহুদিদের কেউ কেউ স্থানীয় আরবদের কাছ থেকে জমি ক্রয় করে বাড়ি নির্মাণ করে, কেউ কেউ পতিত জমি দখলে নিয়ে সেখানে থিতু হয়। আবার কারও কারও জন্য স্বয়ং ব্রিটিশ প্রশাসন জমি অ্যাকোয়ার করে বসতি নির্মাণের বন্দোবস্ত করে দেয়।

ব্রিটিশ উপনিবেশ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত ফিলিস্তিনে ইহুদিদের সংখ্যা ছিল যেখানে কয়েক হাজার, অল্প কদিন যেতে না যেতেই তা লাখ ছাড়িয়ে যায়।

১৯২৭ সাল পর্যন্ত ইহুদিদের ছোট-বড় ২২০টি বসতি গড়ে ওঠে ফিলিস্তিনে। ব্রিটিশ প্রশাসনই নির্মাণ করে দেয় এসব বসতি।

Scanned by CamScanner

১৯৩১-এ এসে দেখা গেল ইহুদিদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পৌনে ২ লাখ। মূল জনসংখ্যার ১৭ ভাগ। অল্প কয়েক বছরে ৪ ভাগ থেকে ১৭ ভাগ—কল্পনা করা যায়?

কল্পনা করা যাক বা না যাক, ইহুদিদের সংখ্যা বাড়তেই থাকল ফিলিস্তিনে। বাড়তে থাকল এর চেয়েও আরও অকল্পনীয় আর দ্রুত হারে।

ইহুদিদের স্বপ্নপূরণের জন্যই এত আয়োজন। তাদের একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের স্বপ্ন। যেখানে নির্বিঘ্নে তারা ধূর্তামির জাল বুনতে পারবে পৃথিবীকে অশান্তির দাবানলে পোড়ানোর জন্য।

ব্রিটিশরা তাদের সেই স্বপ্নপূরণে সর্বাত্মক সহযোগিতা করছে। তাদের সঙ্গে আছে আমেরিকা। বেলফোর ঘোষণা ছিল এই স্বপ্ন বাস্তবায়নেরই একটি পদক্ষেপ।

কিন্তু আমেরিকা আর ব্রিটেন কেন ইহুদিদের এমন সহযোগিতা করবে? বিশ্ব জনমতের বিরুদ্ধে গিয়ে ইতিহাসখ্যাত সন্ত্রাসী জাতি ইহুদিদের জন্য স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তারা কেন এত গরজ দেখাবে?

এই কেন'র জবাবে অনেক কিছু বলা যেতে পারে।

অধিকাংশ ইহুদির বাস ছিল ইউরোপে। এরা কখন কী করে বসে, কোনো ঠিক নেই। এদের বিশ্বাস করা খুব কঠিন। যত দূরে রাখা যায় এদের, ততই মঙ্গল। ফিলিস্তিনে তাদের জন্য একটি রাষ্ট্র বানিয়ে দিলে তারা নিজেদের রাষ্ট্রে চলে যাবে। ইউরোপিয়ানরা আতঙ্ক আর অনিষ্টের আশঙ্কা থেকে রেহাই পাবে।

তা ছাড়া ইহুদিরা খুবই দূরদর্শী জাতি। ব্রিটিশ ও মার্কিন প্রশাসনের প্রতিটি বিভাগে তাদের লোক নিয়োজিত। এরা ভেতর থেকে প্রশাসনকে সব সময় চাপের মুখে রাখে। এদের চাপের কারণেই ব্রিটিশ-মার্কিন প্রশাসন ইহুদিদের জন্য স্বতন্ত্র একটি রাষ্ট্রের পক্ষে তোড়জোড় দেখাতে বাধ্য হয়।

ইহুদিদের আছে বিপুল অর্থবিত্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তাদের শীর্ষস্থানীয় নেতারা ব্রিটেনকে প্রস্তাব দিল, ফিলিস্তিন তো

Scanned by CamScanner

ফিলিস্তিনি আরব মুসলিমদের ওপর গণহত্যা চালানোর কারণে ইহুদিরা যখন বিশ্ব বিবেকের কাছে সমালোচিত হচ্ছিল, তখন জনমত নিজেদের পক্ষে আনার জন্য তারা বেছে নেয় এক ভয়ংকর পন্থা।

ইহুদিদের সবচেয়ে শক্তিশালী আর ভয়ংকর গোপন সন্ত্রাসী সংগঠনের নাম হাগানাহ। ১৯৪০ সালে ২৭৬ জন ইহুদিকে বহন করে নিয়ে আসা একটি জাহাজ হাইফা নৌবন্দরে নোঙর ফেলে। তারা এসেছে ফিলিস্তিনে বসবাসের জন্য। হাগানাহ স্বজাতির নিরীহ এসব মানুষের ওপর গুপ্ত আক্রমণ চালায়। বোমা হামলা করে যাত্রীসহ পুরো জাহাজটাকেই উড়িয়ে দেয় তারা। তারপর প্রচার করে, ফিলিস্তিনি মুসলিমরা নিরীহ ইহুদিদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। বিশ্ব জনমতকে নিজেদের পক্ষে আনার এ ছিল এক ঘৃণ্য অপকৌশল।

তার দুই বছর পর আবার একই কাহিনির পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছিল এই হাগানাহ। সেই হত্যাকাণ্ড ছিল আরও বীভৎস। তখন জাহাজে যাত্রী ছিল ৭৬৯ জন। বিশ্ব মিডিয়ায় এই হত্যাকাণ্ডের দায়ও স্থানীয় ফিলিস্তিনি মুসলমানদের ওপর চাপায় তারা।

এভাবে দমন-পীড়ন, হত্যা আর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইহুদিরা তাদের স্বাধীন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কণ্টকাকীর্ণ পথ পরিষ্কার করতে থাকে। বহিরাগত ইহুদির আগমনে ভারী হতে থাকে ফিলিস্তিনের পুণ্যভূমি।

১৯৪৭ সালে এসে দেখা গেল ইহুদিদের সংখ্যা ৬ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। ইহুদিরা এবার চূড়ান্ত ফয়সালার দিকে এগোয়। ফিলিস্তিনে তাদের একটি রাষ্ট্র চাই। ইহুদি রাষ্ট্র—ইসরায়েল। ৬ লাখ ইহুদির নিরাপত্তার জন্য এই রাষ্ট্র না হলেই নয়!

জাতিসংঘ তো আগে থেকে প্রস্তুত হয়েই ছিল। ১৯৪৭ সালের ২৮ এপ্রিল সাধারণ অধিবেশন বসে জাতিসংঘে। অধিবেশনে ফিলিস্তিন নিয়ে আলোচনা হয়। ফিলিস্তিনের চলমান সংকট নিয়ে তদন্তের জন্য গঠন করা হয় ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি।

Scanned by CamScanner

কমিটির সদস্য ছিল অস্ট্রেলিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, কানাডা, যুগোস্লাভিয়া, গুয়াতেমালা, ভারত, নেদারল্যান্ডস, ইরান, পেরু, উরুগুয়ে ও সুইডেন।

নির্ধারিত সময়ে কমিটি রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে কমিটির সদস্যরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ভারত, ইরান আর যুগোস্লাভিয়া ফিলিস্তিনে সবার সমন্বয়ে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে সুপারিশ করে। আর বাকি সদস্যরা মতামত ব্যক্ত করে সেখানে ইহুদিদের অভয়ারণ্য নির্মাণের জন্য ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে।

সাধারণ পরিষদ উভয় পক্ষের প্রস্তাব মূল্যায়নের জন্য অ্যাডহক কমিটির কাছে তা প্রেরণ করে। উরুগুয়ে আর গুয়াতেমালা দেশ দুটো সেখানেও ইহুদিদের পক্ষে জোর ওকালতি করে। পাকিস্তানসহ আরও কয়েকটি রাষ্ট্র তাদের বিরোধিতা করে। কিন্তু তাদের এ বিরোধিতা ষড়যন্ত্রকারীদের ধোপে টেকে না।

নানা তর্ক-বিতর্কের পর অবশেষে ভোট গ্রহণ করা হয়। ফিলিস্তিন বিভক্তির পক্ষেই রায় আসে। ইহুদিরা জিতে যায়। জিতে যায় তাদের শত বছরের ষড়যন্ত্র আর কূটকৌশল। (নাকি জিতিয়ে নেয়?)

বিভক্তির পক্ষে রায় আসার মূল কারণ আমেরিকা আর রাশিয়া। দুই পরাশক্তিই ইহুদিদের সমর্থন করে।

অ্যাডহক কমিটিতে ফিলিস্তিন বিভক্তির রায় পাস হয়ে ফিরে আসে সাধারণ পরিষদে। সাধারণ পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন পেলে তবেই রায়টি কার্যকর করা যাবে।

১৯৪৭ সালের ২৬ নভেম্বর সাধারণ পরিষদের অধিবেশন। রায়টি এই অধিবেশনেই উপস্থাপন করা হবে। কিন্তু ২৬ তারিখ পর্যন্ত পরিস্থিতি ইহুদিদের অনুকূলে ছিল না। তারা আঁচ করতে পারে এই তারিখে ফিলিস্তিন-বিষয়ক রায়টি পুনর্বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হলে অধিকাংশ রাষ্ট্রই তাদের বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত করবে। নানা টালবাহানা করে তাই এই দিন রায়টি উত্থাপন করাটা তারা বানচাল করে দেয়।

Scanned by CamScanner

তারপর পশ্চিমা শক্তিগুলো ছোট ছোট সদস্যরাষ্ট্রের ওপর চাপ প্রয়োগ শুরু করে। চলে নানা হুমকি-ধমকি, যাতে তারা ফিলিস্তিন বিভক্তির পক্ষে ভোট দেয়।

রায় উত্থাপিত হয় ২৯ নভেম্বর। তত দিনে পরিস্থিতি ইহুদিদের পক্ষে চলে আসে। ভোট অনুষ্ঠিত হয়। আগের সিদ্ধান্তের ওপরই রায় আসে। ফিলিস্তিনকে বিভক্ত করা হবে। পবিত্র ভূমির বুকে প্রতিষ্ঠিত করা হবে ইহুদিদের অভয়ারণ্য। ইসরায়েল।

ফিলিস্তিনকে ভাগ করে দেওয়া হয় বহিরাগত ইহুদি আর যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আসা স্থানীয় আরব মুসলিমদের মধ্যে। সংখ্যালঘু ইহুদিরা পেল ফিলিস্তিনের ৫৭ ভাগ ভূমি আর স্থানীয় অধিবাসী, যারা ছিল মোট জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ, তাদের ভাগে পড়ল মাত্র ৪৩ ভাগ ভূমি। হায়, পৃথিবীর ইতিহাস এর চেয়ে বড় বেইনসাফি আর কি কখনো প্রত্যক্ষ করেছিল?

ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে আরবের বুকে, সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। কিন্তু ফিলিস্তিন? ফিলিস্তিন রাষ্ট্র কীভাবে হবে, কী হবে এর অবকাঠামো, তা অমীমাংসিতই থেকে যায়।

জাতিসংঘ থেকে ইহুদিরা তাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পাস করানোর পর ফিলিস্তিনিদের ওপর শুরু করে নতুন রূপে নির্যাতন। তাদের জঙ্গি গ্রুপগুলো হয়ে ওঠে আরও বেপরোয়া। ঘরবাড়ি লুণ্ঠন, উচ্ছেদ আর একটু প্রতিবাদ করলেই গুলি করে হত্যা—ফিলিস্তিনিদের ওপর যেন কিয়ামতের বিভীষিকা নেমে আসে!

মাত্র ১০০ দিনে ১৭ হাজার ফিলিস্তিনি মুসলিম ইহুদিদের নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে শাহাদাতবরণ করেন।

ভয়ানক এই পরিস্থিতির কারণে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে আবারও আলোচনায় ওঠে ফিলিস্তিন নিয়ে। ১৯৪৮ সালের ২০ এপ্রিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মার্কিন প্রতিনিধি ফিলিস্তিন বিভক্তির ব্যাপারটা স্থগিত রেখে পুরো ফিলিস্তিনকে সরাসরি জাতিসংঘ কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ করার প্রস্তাব পেশ করেন। এ প্রস্তাবকে সামনে রেখে আলোচনার নামে শুরু হয় নতুন প্রহসন।

Scanned by CamScanner

এদিকে একই বছর ১৪ মে ফিলিস্তিন থেকে ব্রিটিশরা চলে আসার কথা। ১৪ মের আগে আগেই একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছা জরুরি।

ইহুদি নেতা ওয়াইজম্যান এক নতুন চাল চাললেন তখন। তিনি গোপনে সাক্ষাৎ করলেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট মিস্টার ট্রুম্যানের সঙ্গে। ব্যস। কেল্লা ফতে করে এলেন তিনি।

১৪ মে স্থানীয় সময় রাত ১২টা। ফিলিস্তিনে ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণের মেয়াদ শেষ। ওয়াশিংটনে তখন ভোর ছয়টা। মিনিটের কাঁটা পেরোতে না পেরোতেই ইহুদি নেতা বেন-গুরিয়ান তেল আবিব থেকে ফিলিস্তিনের বুকে একটি স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্রের ঘোষণা দিলেন। রাষ্ট্রের নাম ইসরায়েল।

এর ঠিক ১০ মিনিটের মাথায় ওয়াশিংটন থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ইসরায়েলকে স্বীকৃতি প্রদান করেন। তারপর ব্রিটেন থেকেও শোনা গেল স্বীকৃতির আওয়াজ। সোভিয়েত ইউনিয়নও সুর মেলাল এরপর। তিন সুপার পাওয়ারের স্বীকৃতি প্রায় একসঙ্গেই পেয়ে গেল ইহুদিরা। আর কী লাগে!

আরব রাষ্ট্রগুলো বিশ্বমোড়লদের এ হঠকারিতা মেনে নিতে পারেনি। ফিলিস্তিনি মুসলিমদের মেনে নেওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। শুরু হয় আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ।

যুদ্ধ যে অনিবার্য, ইহুদিরা আগে থেকেই জানত। তারা আটঘাট বেঁধেই ছিল। কিন্তু আরব রাষ্ট্রগুলোর ভেতর ছিল প্রচণ্ড অনৈক্য আর বিশৃঙ্খলা, অন্যদিকে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র। ইহুদিরা আগ থেকেই এসব রাষ্ট্রে ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে রেখেছিল। যাতে তারা রাষ্ট্র ঘোষণা দেওয়ার পর আরবরা যুদ্ধ করতে এসে এই জালে আটকা পড়ে হাঁসফাঁস করে।

ফলাফল যা হওয়ার তা-ই হলো। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব আর ইসরায়েলি ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করা সম্ভব হলো না আরবদের পক্ষে। ইসরায়েল এই ফাঁকে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করে নিল। অসহায় ফিলিস্তিনিদের ওপর নির্যাতন-নিষ্পেষণ তো আছেই।

Scanned by CamScanner

ফিলিস্তিনিরাও থেমে নেই। নিজেদের যা আছে, যতটুকু আছে, তা দিয়েই প্রতিরোধ করতে লাগল ইহুদিদের।

এল ১৯৬৭ সাল। আবারও বাধল আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ। আরবরা দীর্ঘ প্রস্তুতি নিয়েই নেমেছিল। কিন্তু ইসরায়েলিদের গোপন ষড়যন্ত্র রুখবে কে? এরা আগে থেকেই আরব রাষ্ট্রগুলোতে অনৈক্য আর বিভেদ ছড়িয়ে রেখেছিল। তার ওপর আছে তাদের শক্তিশালী গোয়েন্দা তৎপরতা। আরবদের পূর্বপরিকল্পনা গোয়েন্দা মারফত মুহূর্তেই পৌঁছে যেত তেল আবিবে। ছয় দিনের যুদ্ধে আরবরা আবারও পরাজিত হলো। হারাতে হলো আরও নতুন কিছু ভূখণ্ড।

মিসরের অধীনে থাকা সিনাই উপত্যকা, সিরিয়ার অধীনে থাকা গোলান মালভূমি এবং জর্ডানের অধীনে থাকা পশ্চিম তীর ও পূর্ব জেরুজালেম ইসরায়েলিরা দখল করে নেয়।

আর এর মধ্য দিয়েই মুসলমানদের ভালোবাসার শহর পবিত্র আল-কুদসে ইহুদিদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফিলিস্তিনি মুসলমানরা হয় চূড়ান্ত বঞ্চনার শিকার। সেই বঞ্চনা আর না পাওয়ার হাহাকারে আজও ভারী হয়ে আছে ফিলিস্তিনের আকাশ। এর ভেতরে পৃথিবীর রূপ-বৈচিত্র্যে কত পরিবর্তন এসেছে, জর্ডান নদীতে কলকল রব তুলে গড়িয়েছে কত জল, কিন্তু হতভাগ্য আল-কুদস আর ফিলিস্তিনের মানুষের ভাগ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি। জুলুম, নির্যাতন আর পরাধীনতার গ্লানিতে আজও তারা ক্লান্ত-শ্রান্ত।

তাই বলে যে তারা থেমে আছে, এমন নয়। তাদের সংগ্রাম আর প্রতিরোধ চলমান। বঞ্চনার আগুনে পুড়তে পুড়তে তাদের কেউ কেউ হঠাৎ জ্বলে ওঠে। আর পৃথিবী অবাক হয়ে দেখে প্রতিবাদের অভিনব ভাষা এবং স্বরূপের আগুন-মূর্তি।

Scanned by CamScanner

চিরতরুণ সিপাহসালার

সে রাতে বিছানায় যাওয়া হয়নি তাঁর। সাংগঠনিক ব্যস্ততায় কেটে গেছে অর্ধেকেরও বেশি রাত। তারপর তাহাজ্জুদ।

দুই ছেলে তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। ফজরের আগে আগে ছেলে দুজন গোপন সূত্রে জানতে পারলেন, আজ ভোরে বাবার ওপর হামলা হতে পারে। বাবা তখন তাহাজ্জুদে। আল্লাহর সঙ্গে গভীর আলাপে নিমগ্ন।

তাহাজ্জুদ শেষ হতেই ছেলে দুজন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেলেন তাঁর কাছে, 'বাবা, আজ ফজরের নামাজে আপনার জন্য মসজিদে যাওয়া ঠিক হবে না। আমাদের গোয়েন্দা বিভাগ এই মাত্র জানাল, ইসরায়েলিরা আপনাকে হত্যার জন্য ফজরের সময় মসজিদে হামলা চালাতে পারে।'

ছেলেদের সতর্কীকরণ কথায় তিনি মুচকি হাসলেন। সাহসী কিন্তু উদাস কণ্ঠে বললেন, 'আক্রমণ করলে তো ভালোই। আমাদের এই যে এত প্রচেষ্টা, এত মেহনত, এর উদ্দেশ্য তো শাহাদাতই! বস্তুত, আমাদের সবাইকে আল্লাহ তাআলার কাছেই ফিরে যেতে হবে।'

খানিক পর মসজিদের মিনার থেকে ভেসে এল মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে আজানের সুমধুর ধ্বনি। ছেলে ও সহকর্মীদের তিনি নির্দেশ দিলেন নামাজের প্রস্তুতি নিতে।

গাজক উপকূলীয় জামে মসজিদে নামাজ আদায়ের জন্য বের হয়েছেন তিনি। হুইলচেয়ারে করে। পেছনে পেছনে আসছেন তাঁর ছেলে আর অন্য সহকর্মীরা। ছেলেরা হুইলচেয়ার ঠেলে তাঁকে নিয়ে যাচ্ছেন।

Scanned by CamScanner

তখনো তাঁরা মসজিদে পৌঁছাননি। হঠাৎ হেলিকপ্টারের আওয়াজ শোনা গেল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই হেলিকপ্টার গানশিপ থেকে ছোড়া হলো 'হেলফায়ার মিসাইল'। মিসাইলের আওয়াজে কেঁপে উঠল গাজা স্ট্রিপ রোডের পুরো এলাকা।

ইসরায়েলিদের অভিযান সফল। তিনি শাহাদাতবরণ করেছেন। শাহাদাতবরণ করেছেন দুই সন্তান আর সঙ্গে থাকা ফিলিস্তিনি আন্দোলনের নয়জন উদ্যমী কর্মী নিয়ে।

ফিলিস্তিনের আকাশে ২০০৪ সালের ২২ মার্চ সকালের সূর্য উদিত হলো ফিলিস্তিনি মুক্তি আন্দোলনের অকুতোভয় বীর শায়খ আহমদ ইয়াসিনের শাহাদাতের শোকাবহ বার্তা নিয়ে।

ফিলিস্তিনজুড়ে নেমে এল শোকের ছায়া। প্রিয় নেতাকে হারানোর শোকে মুহ্যমান ফিলিস্তিনিরা। ইসরায়েলিদের অমানবিক এ নিষ্ঠুরতায় হতবাক মুসলিম বিশ্বও।

ইসরায়েলের সব দুশ্চিন্তা এবার ঘুচল। এ লোক খুব ভয়ংকর ছিলেন তাদের কাছে। তাদের অস্তিত্বের জন্য এক মহা হুমকি ছিলেন তিনি।

ফিলিস্তিনের বামপন্থী মুক্তিকামীরা শেষ পর্যন্ত ইসরায়েলকে রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নিয়েছে, কিন্তু শায়খ আহমদ ইয়াসিন কখনোই এদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বরদাশত করেননি। নিজ দলকেও তিনি গড়ে তুলেছিলেন সেভাবে।

তাঁর ঘোষণা ছিল, 'আমাদের পথ হয়তো বিজয়ের নয়তো শাহাদাতের। ইসরায়েলকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার আগ পর্যন্ত এই দুই পথ ছাড়া তৃতীয় কোনো পথে আমরা হাঁটব না।'

তাঁর পুরো নাম শায়খ আহমদ ইসমাইল হাসান ইয়াসিন। ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার ছোট্ট গ্রাম আল-জাওরায় জন্ম। বাবা আবদুল্লাহ ইয়াসিন তাঁকে খুব ছোট রেখে মারা যান। চার ভাই আর দুই বোনের মধ্যে আহমদ ছিলেন সবার বড়।

ছোট ছোট সাত সন্তানকে নিয়ে মা সা'দা আল-হাবিলের ছিল অভাবের সংসার। আল-জাওরার ছোট্ট বাড়িটিতে আহমদ বেড়ে

Scanned by CamScanner

উঠছিলেন ভাইবোন আর মায়ের সঙ্গে। অভাব-অনটন থাকলেও নিজের বাড়িতে ছিলেন, মাথা গোঁজার ঠাঁই ছিল—এ-ও অনেক কিছু।

কিন্তু ১৯৪৮ সালে ইসরায়েলিরা তাঁদের তাড়িয়ে দেয় নিজের আবাসভূমি থেকে। হাজারো গ্রামবাসীর সঙ্গে তাঁরাও নিজেদের মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু হারিয়ে ফেলেন। ইসরায়েলিরা কেড়ে নেয় সবকিছু।

উদ্বাস্তু হয়ে মা আর ছোট্ট ছয় ভাইবোনকে নিয়ে কিশোর আহমদ এসে আশ্রয় নেন গাজার আল-শাতি শরণার্থী শিবিরে। তখন তাঁর বয়স সবে ১১। ১১ বছর বয়সের বালক আহমদের ভেতর সেই যে ইহুদিদের প্রতি চরম ঘৃণা আর ক্ষোভ জন্মেছিল, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তা বেড়েছে বৈ কমেনি।

ছেলেবেলায় মল্লযুদ্ধ আর কুস্তিতে পারঙ্গম ছিলেন আহমদ। বিকেলে শরণার্থী শিবিরের পাশে সমবয়সীদের সঙ্গে মেতে উঠতেন শক্তি ও সাহস প্রদর্শনের এসব খেলায়। খেলতে খেলতে স্বপ্ন দেখতেন, তিনি যখন বড় হবেন, এই সাহস আর শক্তি দিয়েই ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূখণ্ড থেকে তাড়িয়ে দেবেন ইহুদিদের।

একদিন ঘটে গেল দুর্ঘটনা। আহমদের বয়স তখন ১২। বন্ধু আবদুল্লাহ খতিবের সঙ্গে উদ্বাস্তু শিবিরের পাশে সেদিন তিনি মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। আবদুল্লাহর কাছে হেরে যান আহমদ। শুধু হার নয়, আবদুল্লাহ তাঁকে মারাত্মক জখমও করে ফেলেন।

আঘাতটা লেগেছিল গলায়। গুরুতর অবস্থা। আঘাতের তীব্রতায় গলায় প্লাস্টার করাতে হয়। ৪৫ দিন পর প্লাস্টার যখন খোলা হলো, আহমদকে তত দিনে প্যারালাইসিস হুইলচেয়ারে বসিয়ে দিয়েছে। পুরো জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যান তিনি।

হুইলচেয়ারেই তখন থেকে তাঁর চলাফেরা।

আহমদের মন খারাপ হয়ে যায়। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন বড় হয়ে ইসরায়েলিদের তাড়িয়ে দেবেন এ ভূখণ্ড থেকে। কিন্তু এখন যে তিনি পঙ্গু! নিজেই চলাফেরা করতে পারেন না, শত্রু তাড়াবেন কী করে? তাঁর স্বপ্ন কি তবে অঙ্কুরেই ধ্বংস হয়ে গেল? তিনি কি আর ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিতে পারবেন না?

Scanned by CamScanner

না, পঙ্গুত্বকে তাঁর জয় করতে হবে। শারীরিকভাবে তিনি অচল, কিন্তু মন ও চিন্তার দিক থেকে তো পূর্ণ সবল। আহমদ শপথ নিলেন, মেধা ও চিন্তাকে কাজে লাগিয়েই তিনি তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে এগোবেন।

আহমদ গভীর মনোনিবেশ করলেন পড়াশোনায়। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিকের গণ্ডি অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে পেরিয়ে এলেন। উচ্চতর পড়াশোনার জন্য ভর্তি হলেন মিসরের বিশ্বখ্যাত আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে।

উদ্যম নিয়ে আল-আজহারে ভর্তি হলেও শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে সেখানে তিনি আর ক্লাস চালিয়ে যেতে পারলেন না। বাধ্য হয়েই তাঁকে আল-আজহার বাদ দিতে হয়।

আহমদ তারপরও দমে যাওয়ার পাত্র নন। অসাধারণ মনোবল তাঁকে ঘরে বসে বুনিয়াদি বিষয়ে পড়াশোনা ও গবেষণা চালিয়ে যেতে সাহায্য করে। ধর্ম, দর্শন, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে ঘরে বসে একা একা পড়াশোনা করেই তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। সেই সঙ্গে নিজের বাক্‌শক্তিকে কাজে লাগিয়ে হয়ে ওঠেন একজন সুবক্তা।

গাজা শহরের জামে মসজিদে শায়খ আহমদ ইয়াসিন প্রতি জুমার দিন খুতবা দেওয়া শুরু করেন। মানুষ তো অবাক, প্রতিবন্ধী একটা লোক, অথচ কী তেজস্বী আর ঈমানদীপ্ত আলোচনা! দখলদার ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কী সাহসী আর সোচ্চার উচ্চারণ!

শায়খ আহমদ ইয়াসিনের প্রতি মানুষ অল্প দিনেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ তেজস্বী বক্তৃতা ফিলিস্তিনিদের জুলুম-নির্যাতন আর নিষ্পেষণের ক্ষতকে তাজা করে তোলে।

শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী এক যুবক হয়ে ওঠেন মুক্তিকামী ফিলিস্তিনিদের প্রেরণার বাতিঘর।

শায়খ আহমদ ইয়াসিন আশির দশকে গাজা শহরের ইসলামি কমপ্লেক্সের নির্বাহী হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। গড়ে তোলেন ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনী।

Scanned by CamScanner

ইসরায়েলি সেনারা ১৯৮৩ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ইসরায়েল রাষ্ট্র উৎখাতের জন্য তিনি ষড়যন্ত্র করছেন, এই হলো তাঁর অপরাধ। এ অপরাধের শাস্তি দেওয়া হলো ১৩ বছর কারাদণ্ড। শায়খ আহমদ ইয়াসিন ১৩ বছর বন্দী থাকবেন ইসরায়েলের কারাগারে।

কিন্তু ফিলিস্তিনের মুক্তিকামী মানুষের প্রিয় নেতাকে এত দীর্ঘ সময় আটকে রাখার শক্তি ইহুদিদের কোথায়? দুই বছর যেতে না যেতেই ১৯৮৫ সালে পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন (পিএফএলপি) ইসরায়েলের গুরুত্বপূর্ণ কিছু লোককে গ্রেপ্তার করে। ইসরায়েলকে তারা বার্তা পাঠায়—এদের যদি ফিরিয়ে নিতে চাও, তবে শায়খ আহমদ ইয়াসিনকে মুক্তি দাও।

ইসরায়েল নিজেদের লোকদের মুক্তির জন্য শায়খ আহমদ ইয়াসিনকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। আহমদ ইয়াসিন বীরের বেশে বেরিয়ে আসেন ইহুদিদের কারাগার থেকে।

শায়খ আহমদ ছিলেন আপাদমস্তক ইসলামি ভাবধারায় উজ্জীবিত। পিএফএলপির সঙ্গে তাঁর চিন্তার অমিল ছিল নানা জায়গায়। পিএফএলপি বাম ধারার সংগঠন। তাঁদের সঙ্গে কাজে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন না। তিনি ইসরায়েলের সঙ্গে কোনো ধরনের সমঝোতা কিংবা আলোচনার ছিলেন ঘোর বিরোধী। অবৈধভাবে এসে আমাদের ভূমি দখল করে রাষ্ট্র বানিয়েছে, আমাদের সব অধিকার কেড়ে নিয়ে জীবনটাকে দুর্বিষহ করে তুলেছে, এর জবাব একমাত্র অস্ত্র দিয়েই দেওয়া হবে। আলোচনায় বসা মানে তাদের দখলকৃত এলাকাকে রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নেওয়া—এটা অসম্ভব। এই ভূমি থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করাই তাদের একমাত্র প্রাপ্য। এ ভূমির এক ইঞ্চি মাটির ওপরও কোনো হক নেই যাদের, তাদের সঙ্গে কিসের আলোচনা?

কিন্তু পিএফএলপি চাইত তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসে একটা সমাধানে আসতে।

শায়খ আহমদ ইয়াসিন চিন্তাগত এসব মতপার্থক্যের কারণে আন্দোলনকে নিজের মতো করে ইসলামি ভাবধারায় সাজানোর প্রয়াস গ্রহণ করেন। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তাঁর এ সংগ্রামকে তিনি জিহাদ ফি

Scanned by CamScanner

সাবিলিল্লাহ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। পিএফএলপির কাছে যেটা নিছক মুক্তিযুদ্ধ।

১৯৮৭ সালে শুরু হয় প্রথম ইন্তিফাদা। এই সময়টাতেই শায়খ ইয়াসিন প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর সংগঠন 'হরকাতুল মুকাওয়ামাতিল ইসলামিয়্যাহ'। এই সংগঠনই পরবর্তী সময়ে 'হামাস' নামে পরিচিত ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

চিন্তার মতপার্থক্য থাকলেও ফিলিস্তিনি অন্যান্য মুক্তিসংগঠনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চাইতেন শায়খ ইয়াসিন। তিনি বলতেন, 'আমাদের শত্রু অভিন্ন, শত্রুর মোকাবিলাই আমাদের মূল লক্ষ্য। নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে সময় ও শক্তি খরচ করলে প্রকারান্তরে শত্রুকে সহযোগিতা করা হবে।'

১৯৮৯ সালে ইসরায়েলি সেনারা আবারও গ্রেপ্তার করে তাঁকে। সেদিন ছিল ১৮ মে। বিনা বিচারে টানা তিন বছর অন্তরীণ রাখে তাঁকে। চালায় অমানুষিক নির্যাতন।

১৯৯২ সালে এসে আদালতে তোলে। ইসরায়েলি আদালত ইসরায়েলি বিচারপদ্ধতি। ১৫ বছরের কারাদণ্ড। সঙ্গে নির্যাতনের স্টিম রোলার।

এ কয়েক বছর প্রতিবন্ধী এ বিপ্লবীর ওপর এতটাই অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়, তিনি চিরতরে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন।

১৯৯২ সালে তাঁর ১৫ বছর কারাদণ্ডের রায়ের পর হামাসের সশস্ত্র শাখা ইজ্জুদ্দিন আল-কাসসাম ব্রিগেডের সদস্যরা ইসরায়েলি এক সৈন্যকে অপহরণ করে এর বিনিময়ে আহমদ ইয়াসিনের মুক্তি দাবি করেন। ইসরায়েলিরা এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে উল্টো ওই সদস্যদের ওপর হামলা চালায়। হামলায় কয়েকজন হামাস বিপ্লবী শহীদ হন। নিহত হয় অপহরণকৃত ইহুদি সৈন্যটিও।

প্রিয় নেতাকে মুক্ত করার এ কৌশলে হামাস ব্যর্থ হয়। ১৯৯৭ সালে তারা আবারও একটা সুযোগ পায়।

তখন জর্ডানে ছিলেন হামাস নেতা খালেদ মাশাল। তাঁকে হত্যার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল ইসরায়েলের গুরুত্বপূর্ণ এক ইহুদি

Scanned by CamScanner

গোয়েন্দাকে। হত্যা করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় ওই গোয়েন্দা। হামাস এর বিনিময়ে শায়খ আহমদ ইয়াসিনের মুক্তি দাবি করে।

গোয়েন্দাটি ইসরায়েলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তারা এর বিনিময়ে শায়খ আহমদ ইয়াসিনকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। প্রায় নয় বছর পর আহমদ ইয়াসিন মুক্তি লাভ করেন ইসরায়েলের কারাগার থেকে।

এমনিতেই শারীরিকভাবে অচল ছিলেন, ইহুদিদের এ কয়েক বছরের ধারাবাহিক নির্যাতনে শরীরের অবস্থা আরও শীর্ণ হয়ে পড়েছিল। চোখ দুটি তো নির্যাতনের কারণে দৃষ্টিহীন হয়েছে কয়েক বছর আগেই।

শায়খ আহমদ ইয়াসিন এরপরও মানসিকভাবে ছিলেন পুরো নওজোয়ান। তাঁর উদ্যম, সাংগঠনিক তৎপরতা আগের মতোই অদম্য ছিল। বরং এই সময়টাতে পূর্বের চেয়ে আরও তৎপর হয়ে ওঠেন তিনি। ইসরায়েলিদের বিরুদ্ধে একের পর এক জোরদার সব আক্রমণ পরিচালনা শুরু করেন হামাসের সদস্যদের দিয়ে।

ইসরায়েলিরা দেখল, এ লোককে গ্রেপ্তার করে কোনো লাভ নেই। কোনো না কোনোভাবে ছাড়া পেয়ে যায়। একে মুক্তভাবেই কোথাও আক্রমণ করে শেষ করে দিতে হবে।

এরপর থেকে তাঁর ওপর ইসরায়েলিদের শুরু হয় হত্যাচেষ্টা হামলা। বেশ কয়েকটা হামলা চালিয়ে ব্যর্থ হয় তারা।

অবশেষে ২০০৪ সালের ২২ মার্চ ভোরে তাদের সেই হীনচেষ্টা আলোর মুখ দেখে। ফিলিস্তিনি আন্দোলনের প্রেরণার প্রতীক চিরতরুণ শায়খ আহমদ ইয়াসিন নিস্তব্ধ হয়ে যান চিরদিনের জন্য।

Scanned by CamScanner

দ্য লেডি হাইজ্যাকার

দিনটি ছিল ১৯৬৯ সালের ২৯ আগস্ট। রোম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমানের জন্য অপেক্ষমাণ অন্য যাত্রীদের সঙ্গে বসে আছে এক আরব তরুণী।

গৌরবর্ণের গোলগাল তার চেহারাটি দেখলে মনে হবে বেশ শান্তশিষ্ট। কিন্তু তরুণীটির ভেতরে তখন তুমুল উত্তেজনা কাজ করছে। উত্তেজনা যাতে চেহারায় প্রকাশ না পায়, এ জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে।

খানিক পর ভয়ানক এক অপারেশন শুরু করবে সে। অপারেশন শুরুর আগ পর্যন্ত বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে এর সামান্যতম আভাসটুকুও বুঝতে দেওয়া যাবে না। বিমানবন্দরের নিরাপত্তাব্যবস্থার চোখ ফাঁকি দিয়ে তরুণীটি অনেক কায়দা করে তার শরীরে স্বয়ংক্রিয় বোমা ও অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছে।

দুরু দুরু কাঁপছে তার বুক—এই বুঝি ধরা পড়ে গেলাম! কিন্তু চেহারায় সেই ভয়ের ছিটেফোঁটাও প্রকাশ হতে দিচ্ছে না। একদম শান্ত-স্বাভাবিক ভদ্র যাত্রীর মতো বসে আছে লাউঞ্জে।

অদূরেই আরেকটি বেঞ্চে বসে আছে এক আরব যুবক। দেখলে মনে হবে তরুণীটির সঙ্গে তার কোনো চিন-পেহচান নেই। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ বিপরীত। যুবকটি তরুণীর অপারেশনের সহযোগী। সন্দেহের চোখ এড়াতেই একজন আরেকজন থেকে আপাতত দূরত্ব বজায় রাখছে।

Scanned by CamScanner

বোর্ডিং পাসসহ বিমানবন্দরের নিয়মিত কার্যাদি চুকানো হয়ে গেছে তাদের। এখন কেবল বিমানের অপেক্ষা।

একটু পরই নিউইয়র্ক থেকে আসা টিডব্লিউএ ৮৪০ : ৭০৭ বোয়িং বিমানটি রোম বিমানবন্দরে অবতরণ করবে। সেখান থেকে যাত্রী নিয়ে বিমানটি আবারও উড়াল দেবে আকাশে। এথেন্সে একটা যাত্রাবিরতি করে চলে যাবে ইসরায়েলের তেল আবিবে। আরব এই তরুণ ও তরুণী এ বিমানেরই টিকিট কেটেছে।

ভিসা-পাসপোর্ট-টিকিটে তরুণীটির নাম 'ক্যাপ্টেন শাদিয়া আবু গাজালা'।

তার সহযোগী তরুণের নাম সেলিম ইসায়ি। দুজনই ফিলিস্তিনের মুক্তিকামী সংগঠন পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন (পিএফএলপি)-এর একনিষ্ঠ কর্মী।

পিএফএলপির পৃষ্ঠপোষকতায় তারা আজ ইসরায়েলগামী ৭০৭ বিমানটি ছিনতাই করবে। নিউইয়র্ক থেকে এ বিমানে করে ইসরায়েলের আমেরিকান রাষ্ট্রদূত আইজ্যাক রবিনের ফেরার কথা।

আইজ্যাক রবিন ছিলেন ইসরায়েলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। পরে দেশটির প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন তিনি।

ক্যাপ্টেন শাদিয়ার মূল টার্গেট আইজ্যাক রবিন। বিমান ছিনতাইয়ের মাধ্যমে তাঁকে জিম্মি করতে পারলে ইসরায়েল প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি খাবে। বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে আদায় করা হবে অনেক দাবিদাওয়া। সঙ্গে ইসরায়েলি কয়েদখানায় বন্দী কিছু ফিলিস্তিনিকেও মুক্ত করা সম্ভব হবে।

নির্ধারিত সময়ে ৭০৭ বোয়িং বিমানটি রোম বিমানবন্দরে এসে অবতরণ করল। যাত্রীদের ওঠানামা শেষ হলে খানিক পর আবার উড়াল দিল আকাশে।

বিমানটিতে তখন ১৪০ জন যাত্রী। তাদের মধ্যে ক্যাপ্টেন শাদিয়া ও তার সহযোগী সেলিম ইসায়িও আছে। কিন্তু তাদের মূল শিকার আইজ্যাক রবিন কেন যেন এই বিমানে আসেননি।

Scanned by CamScanner

মূল নিশানা মিস হওয়ায় ক্যাপ্টেন শাদিয়ার মনটাই খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু সিদ্ধান্তে সে অনড় রইল—বিমান ছিনতাই করবেই। আইজ্যাক রবিন না এলে কী হলো, ইসরায়েলের আরও যাত্রী আছে, এদের জিম্মি করেই অনেক কিছু আদায় করা যাবে।

তা ছাড়া পুরো বিশ্বে একটা হইচই ফেলা যাবে। বিশ্বকে জানিয়ে দেওয়া যাবে, ফিলিস্তিনিরা তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য যেকোনো ভয়ংকর পন্থা অবলম্বন করতেও পিছপা হয় না।

বিমান তখন তির গতিতে উড়ে যাচ্ছিল এথেন্স অভিমুখে। ক্যাপ্টেন শাদিয়া তার সিটবেল্ট খুলে ফেলল। চোখে চোখে কথা হলো সহযোগী সেলিম ইসায়ির সঙ্গেও। কাজ শুরু করতে হবে। দুজনই নিজ নিজ আসন থেকে উঠে সোজা বিমানের ককপিটে চলে গেল।

পাইলট আপনমনে বিমান চালানোয় মশগুল। ঘাড়ের নিচে শীতল কিছু একটার স্পর্শ পেয়ে ফিরে তাকাল সে। স্পর্শটা ক্যাপ্টেন শাদিয়ার বন্দুকের নলের।

পাইলট ফিরে তাকাতেই ক্যাপ্টেন শাদিয়া শান্ত-শীতল শক্ত কণ্ঠে নির্দেশ দিল, 'বিমানের গতি এথেন্স থেকে ঘুরিয়ে তেল আবিবমুখী করে দাও।'

পাইলট কী করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। বিলম্ব দেখে শাদিয়ার শান্ত-কঠোর কণ্ঠ আবারও বেজে উঠল, 'ভালো চাও তো যা বলছি ঠিকঠাকমতো করো, নইলে পুরো বিমান উড়িয়ে দেব। ফিলিস্তিনি মুক্তিকামীরা প্রাণের মায়া ত্যাগ করে তবেই কোনো অপারেশনে নামে, মনে রেখো।'

বন্দুকধারী তরুণীর কথা পাইলটের একটুও মিথ্যে মনে হলো না। সে ভালো করেই জানে, এদের প্রাণের মায়া বলতে কিছু নেই। বাধ্য ছেলের মতো সে বিমানের গতি পরিবর্তন করে তেল আবিবমুখী করে দিল।

এদিকে সেলিম ইসায়ি বিমানের অন্য কর্মচারীদের হুঁশিয়ার করে দিল, 'কোনো প্রকার চালাকির চেষ্টা করবে না, ভালো চাও তো যা বলি

Scanned by CamScanner

শুনবে। অন্যথায় পুরো বিমান উড়িয়ে দেওয়া হবে। স্বয়ংক্রিয় বোমা কিন্তু আমাদের শরীরেই সেট করা আছে।'

পাইলট বিমানের গতি পরিবর্তন করার পর ক্যাপ্টেন শাদিয়ার কণ্ঠ শোনা গেল বিমানের সাউন্ড বক্সে : 'সম্মানিত যাত্রী মহোদয়গণ, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমরা আপনাদের দুঃসংবাদ দিচ্ছি যে বিমানটি এখন ফিলিস্তিনের মুক্তিকামী মানুষের সংগঠন পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন (পিএফএলপি)-এর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য তারা এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। ইসরায়েল কর্তৃপক্ষ যদি আমাদের দাবি মেনে নেয়, তবে আপনাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। অন্যথায় পরিণতি কী হবে, সময় বলে দেবে।'

ভয়ে-আতঙ্কে একেবারে পাংশু হয়ে গেল যাত্রীদের চেহারা। কী হবে এখন! মৃত্যু ছাড়া বোধ হয় আর রেহাই নেই।

ক্যাপ্টেন শাদিয়া সব বিমানঘাঁটিতে জানিয়ে দিল তার বিমান ছিনতাইয়ের খবর। ইসরায়েল ও তার মিত্র পশ্চিমা দেশগুলো পেরেশান হয়ে ওঠে।

ইসরায়েলি কন্ট্রোল রুম থেকে ওয়্যারলেসে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা হচ্ছিল ক্যাপ্টেন শাদিয়াকে। শাদিয়া গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'ভালো চাও তো গালিগালাজ বন্ধ করো। বিমান ও বিমানের যাত্রীদের অক্ষতভাবে ফেরত চাইলে আমি যা বলি, পালন করো। কন্ট্রোল রুম থেকে ঘোষণা করো, নিউইয়র্ক থেকে আসা টিডব্লিউএ ৮৪০ : ৭০৭ বোয়িং বিমান ফিলিস্তিনি মুক্তিকামীদের সংগঠন পিএফএলপি তাদের বৈধ দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য ছিনতাই করেছে। কথামতো কাজ না করলে এখনই বিস্ফোরণ ঘটাব বিমানে।'

ইসরায়েলি কন্ট্রোল রুমে বসা লোকটি অগত্যা ঘোষণাটি পাঠ করল। মুহূর্তেই পুরো দুনিয়ায় চাউর হয়ে গেল ফিলিস্তিনি এক নারীর দুঃসাহসী এ অভিযানের কথা।

বিমান তখন ফিলিস্তিনের আকাশে। ইসরায়েলি দুটি জঙ্গিবিমান সেটাকে ঘিরে রেখেছে। কিন্তু কিছুই করতে পারছে না। কোনো

Scanned by CamScanner

কড়াকড়ি করলেই ক্যাপ্টেন শাদিয়া তার দেহে বেঁধে রাখা বোমার বিস্ফোরণ ঘটাবে।

বিমানের যাত্রীদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে গেছে।

এদিকে ইসরায়েলিরা কোনোক্রমেই চাচ্ছিল না বিমানটি তেল আবিব বিমানবন্দরে অবতরণ করুক। চরম উত্তেজনার ভেতর সময় পার হচ্ছে।

মধ্যস্থতার জন্য আমেরিকা এগিয়ে এল। ক্যাপ্টেন শাদিয়া ও তার সহযোগী সেলিম ইসায়িরও তেমন ইচ্ছে নেই তেল আবিবে অবতরণের। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইসরায়েলি বর্বরদের এ কথা জানিয়ে দেওয়া—আমরা আমাদের অধিকার আদায়ের জন্য জীবনকেও তুচ্ছজ্ঞান করি। জীবন দেব, তবু তোদের বশ্যতা আমরা স্বীকার করব না। একই সঙ্গে বিশ্ববাসীর কাছেও এ বার্তা পৌঁছে দেওয়া তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে ইসরায়েল কখনোই আমাদের বশ করতে পারবে না। ফিলিস্তিনিরা তাদের মাতৃভূমি উদ্ধারের জন্য যেকোনো ভয়ংকর পথ অবলম্বন করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

ক্যাপ্টেন শাদিয়ার সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। পুরো বিশ্ব ইতিমধ্যেই জেনে গেছে তাদের দুঃসাহসী কার্যক্রমের কথা।

এখন আর বিমান কোথায় অবতরণ করবে, এ নিয়ে ক্যাপ্টেন শাদিয়ার ততটা আগ্রহ নেই। কিন্তু হঠাৎ তার মনে একটা উদগ্র আকাঙ্ক্ষা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। জন্মভূমি দেখার আকাঙ্ক্ষা।

ক্যাপ্টেন শাদিয়ার জন্মভূমি বর্তমান ইসরায়েলের হাইফা শহর। সেই যে চার বছর বয়সে এই শহর থেকে বিতাড়িত হয়ে তার পরিবারের সঙ্গে হিজরত করে এসেছিল, তারপর আর কখনো সেখানে যাওয়া হয়নি।

বিমান তখন ইসরায়েলের আকাশে উদ্দেশ্যহীন উড়ছিল। ক্যাপ্টেন শাদিয়া পাইলটকে নির্দেশ দিল হাইফা শহরের দিকে নিয়ে যেতে। পাইলট খানিক ইতস্ততার সঙ্গে আমতা আমতা করে বলল, 'কিন্তু ম্যাডাম, হাইফায় তো কোনো বিমানবন্দর নেই!'

Scanned by CamScanner

ক্যাপ্টেন শাদিয়া কঠিন গলায় বলল, 'যা বলেছি, করো। দ্বিতীয় কোনো কথা বলবে না। আর শোনো, হাইফায় ঢোকার পর বিমান যথাসম্ভব নিচ দিয়ে চালাবে। আমি আমার জন্মভূমি খুব কাছে থেকে দেখতে চাই।'

ক্যাপ্টেন শাদিয়ার শক্ত-কঠিন কণ্ঠস্বর হঠাৎ ভিজে উঠল। শেষের কথাগুলো কান্নার মতোই শোনাল। বিমানের পাইলট অবাক হয়ে চকিতে একবার তার দিকে তাকিয়ে আবার মনোযোগ দিল আপন কাজে। বিমান ঘুরিয়ে দিল হাইফা অভিমুখে। হাইফার আকাশে যথাসম্ভব নিচু হয়ে শহরটি দুবার প্রদক্ষিণ করল ৭০৭ বিমানটি।

হাতে তাজা গ্রেনেড নিয়ে দুনিয়ার তাবৎ কুৎসিতকে ভুলে গিয়ে বিমানের জানালায় মুখ লাগাল ক্যাপ্টেন শাদিয়া। জানালার বাইরের দৃশ্যের দিকে চাতক পাখির মতো তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ।

চোখে শিশিরবিন্দুর মতো জল টলমল করছে শাদিয়ার। এই তো, এই তো তার জন্মশহর হাইফা। ছোট-বড় খেজুরগাছ আর ধূসর রঙের বালু তাকিয়ে আছে তার দিকে। ওরা কি ডাকছে তাকে?

তাদের বাড়িটা ঠিক কোন জায়গায় ছিল, ঠাহর করার চেষ্টা করল শাদিয়া, পারল না। আচ্ছা, তাদের বাড়িঘর কি আছে এখনো? প্রশ্নটা মনে আসতেই আপন মনে হাসে শাদিয়া। সে হাসির রংটা বড়ই করুণ।

ইসরায়েলি হানাদারেরা তাদের তাড়ানোর পর কি আর আস্ত রাখবে ওসব? বুলডোজার দিয়ে ওই সময়ই হয়তো গুঁড়িয়ে দিয়েছে সবকিছু।

দীর্ঘ ২০ বছর পর শাদিয়া তার জন্মভূমির দেখা পেল। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এত কাছে এসেও জন্মভূমির মাটি স্পর্শ করার সুযোগ হলো না তার।

মাতৃভূমিকে চোখভরে দেখার পর পাইলটকে এবার দামেস্কের উদ্দেশে বিমান চালানোর নির্দেশ দিল শাদিয়া। বিমান ঘুরে গেল দামেস্কের দিকে।

কিছুক্ষণ পর দামেস্ক বিমানবন্দরে অবতরণ করল শাদিয়ার অপহরণকৃত বিমান। পিএফএলপি ইসরায়েলি দুই যাত্রীকে আটক করে বাকিদের ছেড়ে দিল।

Scanned by CamScanner

পরবর্তী সময়ে এ দুই ইসরায়েলিকে জিম্মি করে ইসরায়েলের সঙ্গে বন্দিবিনিময় করে পিএফএলপি।

ক্যাপ্টেন শাদিয়া তাঁর ছদ্মনাম। ৭০৭ বোয়িং বিমানটি ছিনতাইয়ের জন্য ভিসা-টিকিট-পাসপোর্টে নামটি নিয়েছিলেন তিনি। আসল নাম লায়লা খালেদ। ১৯৪৪ সালের ৯ এপ্রিল ফিলিস্তিনের হাইফা শহরে লায়লার জন্ম।

ছোট্ট ছিমছাম আর বেশ পরিপাটি শহর হাইফা। তখন স্বাধীন ছিল শহরটি। ইসরায়েলি দখলদার বাহিনী তখনো পাকাপোক্ত হয়ে ওঠেনি।

জন্মের পর চার বছর স্বাধীন হাইফার আলো-বাতাসে বেড়ে ওঠেন লায়লা। তারপর আসে ইতিহাসের কলঙ্কজনক সেই অধ্যায়। ১৯৪৮ সাল। বর্বর ইহুদিরা জুলুম-নির্যাতন আর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনের বুকে প্রতিষ্ঠা করে নতুন এক ইহুদি রাষ্ট্র—ইসরায়েল।

অন্যান্য শহরের মতো হাইফাকেও তাদের অবৈধ দখলদারত্বের অক্টোপাসে আবদ্ধ করে ফেলে। লাখ লাখ স্থানীয় আরব মুসলিমকে তারা বাস্তুচ্যুত করে।

কিছু আরব মুসলিম এসব নির্যাতন সহ্য করেও মাটি কামড়ে পড়ে থাকে নিজেদের বাপ-দাদার ভিটায়। জন্মমাটি ছেড়ে দিতে এত সহজে কি কারও মন চায়?

লায়লার পিতা-মাতাও মাটি কামড়ে হাইফাতেই থেকে গেলেন। গুলি-বোমা আর গ্রেনেডের কানফাটা আওয়াজের ভেতর লায়লা বেড়ে উঠতে লাগলেন।

কিন্তু এভাবে আর কত দিন? সারাক্ষণ আতঙ্কের মধ্যে থেকে জীবনযাপন কত দিন আর সম্ভব? সন্তানসন্ততি এমনকি নিজের প্রাণেরও এক মুহূর্তের নিরাপত্তা নেই। যেকোনো সময় ইসরায়েলি সেনারা এসে হামলে পড়তে পারে।

এই চিন্তা থেকে লায়লার পিতা সিদ্ধান্ত নিলেন স্ত্রী-সন্তানকে দক্ষিণ লেবাননে পাঠিয়ে দেবেন। আর নিজে থেকে যাবেন হাইফায়।

Scanned by CamScanner

জীবনবাজি রেখে আমৃত্যু লড়ে যাবেন দখলদার ইসরায়েলিদের বিরুদ্ধে।

লায়লার মা বেঁকে বসলেন। স্বামীকে রেখে তিনি হাইফা ছাড়বেন না। যেতে যদি হয় তবে সবাই যাবে। স্বামী এখানে অনিশ্চয়তার মাঝে থাকবেন আর তিনি সন্তানসন্ততি নিয়ে লেবাননে নিরাপদ জীবনযাপন করবেন, এ হতে পারে না।

লায়লার বাবা সন্তানসন্ততির দোহাই দিয়ে তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, 'এ অনিরাপদ শহর তোমাকে ছাড়তে হবে অন্তত আমাদের বাচ্চাদের নিরাপত্তার জন্য। এরা বড় হয়ে আবার ফিরে আসবে, এ ভূমি তাদেরই উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু তোমার সঙ্গে যদি আমিও চলে যাই, তাহলে তো এটা প্রিয় জন্মভূমির সঙ্গে গাদ্দারি হবে। আমাকে থাকতে হবে। দখলদার এ বাহিনীর সঙ্গে আমৃত্যু আমি লড়াই করে যাব। তত দিনে আমার ছেলেমেয়েকে তুমি ফিলিস্তিন পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ের জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলো।'

লায়লার মা আর কথা বাড়ালেন না। স্বামীকে ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ লেবাননের উদ্দেশে পা বাড়ালেন।

সময় বয়ে যেতে লাগল তার আপন গতিতে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে উঠছিলেন লায়লাও। কিন্তু লায়লা জানতেন না তাঁর বাবা কোথায় আছেন। হাইফা ছাড়ার পর বাবার আর কোনো খবর পৌঁছায়নি তাঁদের কাছে। বাবা আছেন নাকি শহীদ হয়ে গেছেন কিছুই জানেন না তাঁরা।

কিশোরী লায়লার ভেতর সেই ছোটবেলা থেকেই একটা ঘৃণা জন্মে গিয়েছিল হানাদার ইসরায়েলিদের প্রতি। ইসরায়েলিদের নাম শুনলেই ঘৃণায় রি রি করে উঠত তাঁর পুরো সত্তা। প্রতিশোধের অদম্য এক আক্রোশ ছড়িয়ে পড়ত শরীরের শিরা-উপশিরায়।

লায়লার বয়স বাড়তে থাকে। ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয় তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তার পাপড়িগুলো। জন্মভূমি হাইফার কথা তিনি ভুলতে পারেন না।

Scanned by CamScanner

ভুলতে পারেন না ছোটবেলার বন্ধু ও সহপাঠীদের কথা। ওরা এখন কোথায় আছে? বেঁচে আছে তো? নাকি ইসরায়েলি বর্বরদের গ্রেনেডের আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে?

বাবাকে প্রচণ্ড মনে পড়ে লায়লার। মনে পড়লেই চোখ ফেটে কান্না আসে তাঁর।

বাবা কোথায় আছেন? জন্মভূমির জন্য বাবার এত্ত মায়া! আমাদের দূরে সরিয়ে তিনি সেখানেই পড়ে রইলেন মাটি কামড়ে, আর সে মাটির স্বাধিকারের জন্য জীবনবাজি রেখে আমাদের থেকে হারিয়ে গেলেন।

লায়লা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি বাবার মতো হবেন।

বাবার মতোই নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে ইসরায়েলিদের মোকাবিলা করবেন। কিন্তু বাবার মতো হারিয়ে যেতে চান না তিনি।

তাঁর প্রতিজ্ঞা—তিনি পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিন ইসরায়েলিদের দখলদারি থেকে উদ্ধার করবেনই।

কৈশোরের সেই প্রতিজ্ঞা লায়লা খালেদ তাঁর তারুণ্যে এসে বাস্তবতায় রূপ দেন। ১৯৬৭ সালে তিনি যোগ দেন ফিলিস্তিন মুক্তি আন্দোলনের সশস্ত্র সংগঠন পপুলার ফ্রন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টাইনে। সংগঠনটি পিএফএলপি নামে পুরো বিশ্বে আলোড়ন তুলেছিল। এই আলোড়নের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন লায়লা খালেদ।

পিএফএলপিতে যোগদানের অল্প দিনের ভেতরে তিনি সশস্ত্র প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেন। একজন নারী হয়ে সশস্ত্র প্রশিক্ষণে লায়লা যে যোগ্যতা দেখান, কমান্ডার হতবাক হয়ে যান তাঁর পারফরম্যান্সে।

তিনি বুঝতে পারেন ভেতরে আগুন পোষা এ তরুণীর দ্বারা ভয়ংকর সব অপারেশনেও সফল হওয়া সম্ভব। লায়লাকে পিএফএলপি আলাদা একটা গুরুত্ব দিতে থাকে। দুঃসাহসী কোনো অপারেশন চালাতে হবে এ তরুণীর দ্বারা।

লায়লা তখন প্রতিশোধের আগুনে উন্মাতাল এক তরুণী। ইসরায়েল নাম শুনলেই দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে তাঁর ভেতরটা।

Scanned by CamScanner

বাবার কথা মনে পড়ে তাঁর। এই ইসরায়েলিদের কারণে পিতৃআদর থেকে তিনি বঞ্চিত আজ কত দিন! চোখের তারায় ভেসে ওঠে শৈশবের স্মৃতিমাখা হাইফা। হাইফার খেজুরবীথি, জলপাই বাগান, বিকেলের খেলাধুলা আর হই-হুল্লোড়ের কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে খেজুরবীথির ধূলিকণায়!

পিএফএলপিতে যোগ দেওয়ার পর প্রশিক্ষণ আর ছোটখাটো অপারেশনের ভেতর দিয়ে লায়লার বছর দুয়েক কেটে যায়। ৬৭ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে তিনি দুঃসাহসিক বিভিন্ন অভিযানে অংশ নেন।

তারপর আসে ১৯৬৯ সালের সেই ২৯ আগস্ট। সেই দুঃসাহসী বিমান ছিনতাই অভিযান। এই ঘটনায় পুরো বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন লায়লা খালেদ।

এরপর আবারও তিনি বিমান ছিনতাই করেন। দ্বিতীয় বারেরটা ছিল ১৯৭০ সালে। ইসরায়েলি একটি বিমান। বিমানের আরোহী ছিলেন ইসরায়েলের বড় এক জেনারেল। এই জেনারেলকে বিমানেই হত্যা করেন প্রতিশোধের আগুনে দগ্ধ এই দুঃসাহসী তরুণী।

১৯৭০ সালের এ অভিযানটা মোটেই সহজ ছিল না। কারণ, তত দিনে তাঁর মুখটা বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রচারের ফলে সবার কাছে পরিচিত হয়ে গিয়েছিল। এ জন্য আগের মতো কেবল নাম পাল্টিয়ে এ অভিযান পরিচালনা মুশকিল হয়ে পড়ে। কিন্তু মুশকিলকে যেকোনো উপায়ে আসান করতে হবে। পিছপা হওয়ার পাত্রী নন লায়লা খালেদ। অভিযানে তাঁকে সফল হতে হবে যেকোনো উপায়ে।

লায়লা সিদ্ধান্ত নেন তাঁর মুখে প্লাস্টিক সার্জারি করাবেন। মানুষ প্লাস্টিক সার্জারি করায় নিজের রূপ বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য মোটেও তা নয়। উদ্দেশ্য কেবল চেহারা পাল্টানো, কেউ যাতে তাঁকে চিনতে না পারে। ১৯৭০ সালের ভয়ংকর সেই অভিযান নিজের মুখ পাল্টিয়েই তিনি করেছিলেন। পুরো বিশ্ব দ্বিতীয়বারের মতো অবাক হয়েছিল ফিলিস্তিনের এ আগুনকন্যার দুঃসাহস দেখে।

Scanned by CamScanner

ফিলিস্তিনি সংগ্রামের ইতিহাসে লায়লা খালেদ এক উজ্জ্বল তারকার নাম। একজন নারী হয়েও কীভাবে অমন দুঃসাহসী অভিযান পরিচালনা করা যায়, তার জ্বলন্ত উদাহরণ এই বীরাঙ্গনা।

একসময়কার রক্ত শীতল করা চাঞ্চল্যকর অভিযানের মূল নায়িকা লায়লা খালেদ আজ বার্ধক্যে উপনীত। কিন্তু তাঁর সংগ্রাম আজও থামেনি। নিজের সবটুকু বিলিয়ে আজও তিনি সংগ্রাম করে যাচ্ছেন ফিলিস্তিনকে ইহুদিদের দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য।

Scanned by CamScanner

ওফা

সুন্দর একহারা গড়নের সৌম্য-কঠিন মেয়েটির নাম ওফা। লালচে চুল কাঁধ ছাড়িয়ে গেছে। চেহারায় কেমন একটা কাঠিন্য ভাব।

ইসরায়েলের রামলে শহরে ছিল তার পৈতৃক নিবাস। ১৯৪৮ সালে দখলদার ইসরায়েল জোর করে ওফার পিতা-মাতাকে বাস্তুচ্যুত করে। সে ইতিহাস সবার জানা।

ওফার মা-বাবা আরও লাখো বাস্তুচ্যুত মানুষের সঙ্গে এসে আশ্রয় নেন ফিলিস্তিনের পশ্চিম জেরুজালেমের আল-আমারি শরণার্থী শিবিরে। আশির দশকে এখানেই জন্ম হয় ওফার।

শিবিরের ঘিঞ্জি পরিবেশ, চারদিকে দারিদ্র্যের প্রকট চিহ্ন, মানবেতর জীবনযাপন—এসবের ভেতরই তার বেড়ে ওঠা। জীর্ণশীর্ণ দুটো মাত্র কামরা নিয়ে তাদের বসতি ছিল।

মা-বাবা আর তিন ভাইকে নিয়ে এখানেই কেটেছে ওফার শৈশব-কৈশোর। বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের শরণার্থী শিবিরকে ইসরায়েলি সৈন্যরা খুব ভয় পেত। আশির দশকে ওফা যখন বেড়ে উঠছিল, তখন ফিলিস্তিনিদের অসহযোগ আন্দোলন ইন্তিফাদার যুগ।

ইন্তিফাদার মূল চালিকাশক্তি ছিল ওফার মতো কিশোর-কিশোরীরা। এরা প্রত্যেকেই যেন একেকটা বারুদ। ইসরায়েলি কোনো সৈন্যকে কেবল দেখলেই হলো, তাদের ভেতরের সুপ্ত আগুন মুহূর্তেই জ্বলে উঠত দাউ দাউ করে। ইটপাটকেল কিংবা পাথর—হাতের কাছে যা পেত

Scanned by CamScanner

ছুড়ে মারত ইসরায়েলি সৈন্যদের দিকে। পরিণতি কী হবে, একবার ভেবেও দেখত না তারা।

ইসরায়েলি সৈন্যদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা কাজ করত ফিলিস্তিনি শিশু-কিশোরদের ভেতর। তারা ভালো করেই জানত, এদের কারণেই আজ তারা শরণার্থী শিবিরে মানবেতর জীবনযাপন করছে। এরাই বাস্তুচ্যুত করে দেশান্তর করেছে তাদের পিতৃপুরুষদের। কেড়ে নিয়েছে তাদের শান্ত-স্বাভাবিক সমৃদ্ধির জীবনযাপন।

অন্যান্য কিশোর-কিশোরীর মতো ওফাও নিয়মিত শরিক হতো ইন্তিফাদায়। স্কুলে যাওয়ার পথে সুযোগ পেলেই লেগে যেত ইসরায়েলি সৈন্যদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছুড়তে।

ইন্তিফাদা যখন জোরেশোরে শুরু হলো, তখন স্কুল বাদ দিয়ে রোজ রোজ সে মিছিলে চলে যায় দেখে মা-বাবা তার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেন। তারপরও লুকিয়ে মা-বাবার চোখ ফাঁকি দিয়ে সে চলে যেত মিছিলে।

স্কুল আর মা-বাবার চোখ ফাঁকি দিয়ে এভাবে আন্দোলনে যাওয়ার কারণে ওফাকে এক ক্লাসে টানা তিন বছর কাটাতে হয়েছিল।

কিশোরী ওফার চোখে তার মাতৃভূমি ফিলিস্তিন স্বাধীন করার স্বপ্ন জ্বলজ্বল করত সারাক্ষণ। ইহুদিদের পদচারণ থেকে পবিত্র ভূমি আল-কুদসকে রক্ষা করার প্রত্যয় তাকে হরদম তাড়া করে ফিরত।

১৫ বছর বয়েসেই ওফার বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের কিছুদিনের মাথায় গর্ভবতী হয় সে, কিন্তু সন্তানের মা হতে পারে না। কোনো সমস্যার কারণে গর্ভপাত হয়ে যায়। সেই সঙ্গে তার মা হওয়ার সুযোগটিও চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে যায়।

একে তো সন্তান না পাওয়া এবং চিরদিনের জন্য বন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার কষ্ট, তার ওপর গর্ভপাতের কারণে স্বামীর পক্ষ থেকে নানা প্রকারের বাজে ব্যবহার—সব মিলিয়ে মানসিকভাবে খুব বড় রকমের একটা বিপর্যয় ঘটে ওফার জীবনে।

Scanned by CamScanner

স্বামীর সঙ্গে কোনোভাবেই আর বনিবনা করতে পারে না সে। একসময় নিজ থেকেই ডিভোর্স দিয়ে স্বামীর অধিকার থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনে।

তারপর শুরু হয় ওফার উদ্দাম জীবনযাপন। একজন মুসলিম রমণী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার চেয়ে পশ্চিমা ধাঁচে সাজিয়ে নেওয়ার প্রয়াসটাই তার বেশি ছিল। ধর্মীয় বিধিনিষেধের খুব একটা তোয়াক্কা করত না ওফা। এই শিক্ষাটা পরিস্থিতির কারণে হোক কিংবা গাফলতির কারণে, তার বেড়ে ওঠার সময়টাতে সে পায়নি।

পশ্চিমা স্টাইলের পোশাক পরত সে, বোরকা কিংবা হিজাব গায়ে জড়াত না খুব একটা। তারুণ্যের সময়টাতে ধর্ম ও রাজনীতি দুটো থেকেই নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

ছোটবেলার সেই আন্দোলনমুখর মনমানসিকতা বিয়ে-বিচ্ছেদ এবং সন্তান না পাওয়ার হতাশার কারণে স্তিমিত হয়ে যায়। একটা বিতৃষ্ণা চলে আসে এসবের প্রতি। বরং নিজের জীবনের প্রতিই সে আর খুব একটা আগ্রহবোধ করে না। তবে তার তিন সহোদর ফিলিস্তিনিদের প্রাণের সংগঠন ফাতাহর সঙ্গে জড়িত ছিল।

ধর্ম ও রাজনীতি থেকে বিমুখ থাকলেও ওফা আর্তসামাজিক সেবার প্রতি ছিল খুবই উৎসাহপ্রবণ। এ অভ্যাসটা তার ছোটবেলা থেকেই ছিল।

বিবাহবিচ্ছেদের পর দিনের একটা সময় সে বিনা পারিশ্রমিকে আমারি শরণার্থী শিবিরের মূক ও বধির ছেলেমেয়েদের পড়াত। পাশাপাশি খণ্ডকালীন একটা প্যারামেডিক চাকরি জুটিয়ে নিয়েছিল।

চাকরি আর সমাজসেবা—এই দুইয়ের মধ্যে নিজের জীবনটাকে সীমাবদ্ধ করে ওফা তার অতীতটা ভুলে থাকার চেষ্টা করছিল। ফিলিস্তিনের দুঃসহ বাস্তবতা সম্পর্কে তখন খুব একটা ভাবনা কাজ করত না তার ভেতর।

Scanned by CamScanner

প্যারামেডিক চাকরির সূত্র ধরে ২০০০ সালে ওফার পরিচয় হয় রেড ক্রিসেন্টের সঙ্গে। বিভিন্ন কাজে রেড ক্রিসেন্টের কাছে তখন তার ঘন ঘন যাতায়াত শুরু হয়।

ওই সময়টাতে ফিলিস্তিনিদের অসহযোগ আন্দোলন ইন্তিফাদা আবার চাঙা হয়ে ওঠে। গাজা ও পশ্চিম তীর তখন ইসরায়েলিদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর।

অন্যান্য জায়গার মতো রামাল্লার কাছাকাছি ত্রয়োশ জংশনে প্রতি শুক্রবার জুমার নামাজের পর মুসল্লিরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করত। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী বিক্ষোভ দমনের নামে সাধারণ মুসল্লিদের ওপর চালাত নৃশংস আক্রমণ।

প্রতি সপ্তাহেই হতাহতের সংখ্যা মাত্রা ছাড়িয়ে যেত। আহত ব্যক্তিদের সেবা-শুশ্রূষা, ঘটনাস্থল থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি কাজে রেড ক্রিসেন্টের হয়ে ওফাকে জড়িয়ে পড়তে হয়।

এই সময়টাতেই ওফার ভেতরে কৈশোরের ঘুমিয়ে পড়া সেই বিদ্রোহী চরিত্র আবার জেগে ওঠে। নির্যাতিত ফিলিস্তিনিদের ওপর নৃশংস এসব আচরণ তাকে প্রচণ্ড রকম ভাবিয়ে তোলে।

অন্য সব ব্যস্ততা বাদ দিয়ে ওফা তখন থেকে কেবল ইসরায়েলিদের নৃশংসতার শিকার ফিলিস্তিনি আহত মানুষের সেবা-শুশ্রূষায় নিজেকে সঁপে দেয়। যেখানেই ইসরায়েলিরা আক্রমণ করেছে শুনতে পায়, সেখানেই সে ছুটে যায়। বিক্ষোভের ভেতর থেকে আহত ব্যক্তিদের বের করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

ইসরায়েলিদের গুলি চলাকালেও সে ঢুকে পড়ে ফিলিস্তিনিদের বিক্ষোভের ভেতর, কেউ আহত হলেই তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসা দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

একদিন এক বিক্ষোভে ফিলিস্তিনি এক কিশোর মারাত্মক আহত হয়। ওফা তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে।

কিশোরটিকে দেখে তার ভেতরের বুভুক্ষু মাতৃত্ব সত্তাটি জেগে ওঠে। কেবলই মনে হতে থাকে, তার সন্তানটি যদি পৃথিবীতে আসতে পারত, তবে এই কিশোরের মতোই হতো।

Scanned by CamScanner

টানা এক সপ্তাহ অবধি ওফা আহত কিশোরটিকে মাতৃআদরে শুশ্রূষা দেয়। কিন্তু কুদরতের ফয়সালা তো ভিন্ন, এক সপ্তাহের মাথায় ছেলেটি মারা যায়।

ছেলেটির মৃত্যুতে প্রচণ্ড শক খায় ওফা। আহত কিশোরটিকে হয়তো নিজের সন্তানের জায়গায় কল্পনা করার কারণেই এমনটা হলো। হানাদার ইসরায়েলিদের ওপর তার আক্রোশটা বেড়ে গেল বহুগুণে।

কৈশোরের প্রতিশোধোন্মুখ সত্তাটা হইহই করে উঠল ওফার ভেতর। এর প্রতিশোধ নেবে ওফা। শক্ত প্রতিশোধ!

ইসরায়েলের দখলকৃত পশ্চিম তীরের ছোট্ট একটি শহর তাইবে। অধিকারবঞ্চিত ফিলিস্তিনিদের প্রতিবাদী মিছিল-বিক্ষোভ এখানটায় চাঙা থাকে সব সময়। ইসরায়েলি সেনাদের উপস্থিতি তাই একটু বেশিই থাকে শহরটিতে।

দিনটি ছিল ২০০২ সালের ২৭ জানুয়ারি। মুক্তিকামী জনগণ তাইবে শহরে বিক্ষোভ করছিল অন্যান্য দিনের মতো। ইসরায়েলি সেনারা বিক্ষোভ দমনের জন্য নিজেদের গোছগাছ করে নিচ্ছিল।

একটি ব্রিজের গোড়ায় তাদের বড় একটি অংশ সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে, বিক্ষোভটা এদিকে এলেই শুরু হবে নির্বিচারে গুলিবর্ষণ।

প্রতিবাদী জনতা বিক্ষোভ করতে করতে এদিকেই আসছিল। আর কিছুদূর এগোলেই ব্রিজের গোড়া, যেখানটায় দাঁড়িয়ে আছে ইসরায়েলিরা।

বিকট আওয়াজে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে বিস্ফোরণটা ঘটল ঠিক একদম ইসরায়েলি সৈন্যদের নাকের ডগায়। শিকারের জন্য প্রস্তুত সেনারা মুহূর্তেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

বিস্ফোরণের আঘাতে এক ইসরায়েলির দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। শখানেক হয় গুরুতর আহত। ইসরায়েলি সেনাশিবিরে তুমুল আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এই ঘটনায়।

বিস্ফোরণটা ছিল আত্মঘাতী। যে লোক বিস্ফোরক বহন করে নিয়ে এসেছিল, তার দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে।

Scanned by CamScanner

ছিন্নভিন্ন দেহ একত্র করে এতটুকু বোঝা যায়, বিস্ফোরক বহনকারী একজন ফিলিস্তিনি তরুণী। কিন্তু তার নামধাম-পরিচয় শনাক্ত করা মুশকিল হয়ে পড়ে।

২০০২ সালের ৩১ জানুয়ারি। তাইবে শহরে আত্মঘাতী হামলার চতুর্থ দিন। আল-আমারি শরণার্থী শিবিরের সরু গলিপথ ধরে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে কয়েক হাজার মানুষের একটি মিছিল এগিয়ে চলছে ধীরগতিতে।

মিছিলের সম্মুখভাগে কয়েক তরুণের কাঁধে ফিলিস্তিনের পতাকা মোড়ানো একটি কফিন। সবাই জানে কফিনটি ফাঁকা। কারও লাশ নেই কফিনে।

কফিনের সামনের দিকে সৌম্য-কঠিন চেহারার এক তরুণীর ছবি সাঁটা। চোখ দুটো থেকে যেন আগুন টিকরে পড়ছে। তরুণীটি আর কেউ নয়—ওফা।

চার দিন আগে তাইবে শহরের আত্মঘাতী বিস্ফোরণটা সে-ই ঘটিয়েছে। পবিত্র ভূমি আল-কুদস উদ্ধারের জন্য তার আত্মদানকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাতেই আল-আমারি ক্যাম্পের শরণার্থীরা এ প্রতীকী শবযাত্রার আয়োজন করেছে।

ওফাই প্রথম নারী, পবিত্র ভূমি আল-কুদস রক্ষা করতে যে আত্মাহুতি দিয়েছে। ইহুদিদের দখলদারিত্ব থেকে ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার জন্য আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে সে প্রমাণ করেছে, মৃত্যুও প্রতিবাদের অন্যতম একটা মাধ্যম।

ওফার এ আত্মদান মুক্তিকামী ফিলিস্তিনিদের আজও প্রেরণা জোগায়। তার নামটা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার ঝলক খেলে যায় প্রত্যেক ফিলিস্তিনির চেহারায়।

Scanned by CamScanner

তেজস্বিনী

না, কিছুতেই সে মুখের নেকাব সরাবে না।

সেনা চৌকিতে থাকা সৈন্যরা কয়েকবার আদেশ করল। উঁহু, সে সরাবেই না নেকাব। কেন সরাবে? কী অধিকার আছে তাদের এ হুকুম করার?

'না, আমি নেকাব খুলব না। কিছুতেই খুলব না। তোমরা দখলদার, লজ্জা করে না স্থানীয় ফিলিস্তিনিদের অযথা হয়রানি করতে?'

সৈন্যরা আবারও আদেশ দিল নেকাব সরানোর জন্য। সেই সঙ্গে অপমানসূচক মন্তব্য।

মেয়েটি হাত নেড়ে নেড়ে প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, 'আমি কেন নেকাব খুলব? এটা আমার অধিকার। আমার ব্যক্তিস্বাধীনতা। তোমরা স্থানীয় ফিলিস্তিনিদের, যারা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা, তাদের জীবনটাকে দুর্বিষহ করে তুলেছ। এমনকি তাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও নাক গলাও। এ অধিকার তোমরা কোথায় পেলে?'

ঠাস ঠাস করে গুলির শব্দ হলো। মাত্র কয়েক গজ দূর থেকে মেয়েটাকে গুলি করল ইসরায়েলি সৈন্যরা। একটা-দুটো নয়, একে একে ১৫টা গুলি, যেন সব আক্রোশ সুদে-আসলে মেটাল সৈন্যগুলো।

বীরাঙ্গনা মেয়েটি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল। কালো বোরকায় ঢেকে আছে তার আপাদমস্তক। দাঁড়ানো থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে। চেক পয়েন্টের সম্মুখভাগটা রক্তে ভেসে গেল।

Scanned by CamScanner

মেয়েটি গুলি খেয়ে মাটিতে পড়েও প্রতিবাদ করে যাচ্ছিল, 'তোমরা দখলদার, লজ্জা করে না তোমাদের...?'

মেয়েটির নাম হাদিল সালাহ আল-হাশলামুন। ভার্সিটিতে পড়ুয়া ১৮ বছরের এক তেজস্বী ফিলিস্তিনি তরুণী।

সেদিন ছিল ২০১৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর। মঙ্গলবার। কোরবানির ঈদের আর মাত্র দুই দিন বাকি।

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের আল-খলিল শহর। আশ-শুহাদা সড়কের ওপাশে ছিল হাদিলের আত্মীয়ের বাসা। সেদিন ভোরে হাদিল গিয়েছিল সেখানে।

ফেরার পথে ইসরায়েলি সেনা চৌকিতে তাকে আটকানো হয়। তারপর এই করুণ কিন্তু গৌরবময় গল্পের জন্ম।

গুলি করার পর আধা ঘণ্টার মতো হাদিল চেক পয়েন্টের সামনে পড়ে কাতরিয়েছে। তেজস্বী এই তরুণীর হুংকার ইসরায়েলিদের গায়ে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। কাউকেই তারা কাছ ভিড়তে দেয়নি। মানবাধিকার সংস্থা রেড ক্রিসেন্টের অ্যাম্বুলেন্স এসেছিল তাকে নিতে, সৈন্যরা দেয়নি।

আধা ঘণ্টা পর হাদিল যখন রক্তক্ষরণে নিস্তেজ হয়ে পড়ে, সৈন্যরা ইসরায়েলি হাসপাতালে নিয়ে যায়। নেকাব না সরানোর জন্য ১৫টি গুলিতে ঝাঁঝরা হওয়া হাদিলের প্রাণবায়ু ততক্ষণে আল্লাহর কাছে চলে গেছে উড়ে।

হাদিলের এমন বীরত্বপূর্ণ সাহস ও অবিচলতা দেখে পুরো বিশ্ব সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিল। একজন মুসলিম তরুণীকে নিজের জীবনে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার ব্যাপারে কতটা কঠোর এবং তৎপর হতে হয়, হাদিল তার জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে গেছে।

মুসলিম যুবকদের নিঃশব্দে বলে গেছে, দেখো, তোমাদের রক্ত যখন শীতল হয়ে যায়, যখন তোমরা ঘুমিয়ে পড়ো, আমরা, মুসলিম মেয়েরা তখন নিজেদের হেফাজতের জন্য জেগে উঠি। জীবন দিয়ে হলেও নিজেদের সম্ভ্রমের এতটুকু ক্ষতি করতে দিই না। যে সম্ভ্রম রক্ষার দায়িত্ব প্রভু তোমাদের ওপর অর্পণ করেছিলেন।

Scanned by CamScanner

সাহসিকা হানজালা

নাম তার আহেদ তামিমি। অধিকারহারা ফিলিস্তিনিদের প্রেরণার প্রতীক। মুসলমানদের প্রথম কিবলার শহর পবিত্র আল-কুদস উদ্ধারের উদগ্র বাসনা বুকে পোষা এক জ্বালাময়ী কিশোরী।

আহেদ যখন একেবারে ছোট, বয়স মাত্র চার বছর, তখন থেকেই দখলদার ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সে সোচ্চার। ইসরায়েল নামটা শুনলেই ঘৃণায় রি রি করে ওঠে তার সমগ্র সত্তা। প্রতিশোধ আর প্রতিরোধের আকাঙ্ক্ষায় প্রতিদিন সে নতুন করে শপথ নেয় মনে মনে। ইসরায়েলি হানাদার বাহিনী, যারা তার প্রিয় মাতৃভূমির ওপর জবর দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করে অবিচার করছে, জুলুম আর নির্যাতনে অতিষ্ঠ করে তুলেছে তাদের শান্ত-স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, এদের সে ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে তার প্রিয় মাতৃভূমি থেকে।

বাবা-মায়ের সঙ্গে সেই চার বছর বয়সেই আহেদ নিয়মিত শামিল হতো ফিলিস্তিনিদের প্রতিবাদ মিছিলে। প্ল্যাকার্ড উঁচিয়ে শরীরের সবটুকু শক্তি একত্র করে স্লোগান দিত রক্তখেকো ইসরায়েলের বিরুদ্ধে। তার প্ল্যাকার্ডে লেখা থাকত, 'এ ভূমি তোমাদের নয়, বের হও এ ভূখণ্ড থেকে!'

আহেদের বয়স তখন ছয় কি সাত বছর। একদিন বাড়ির সামনে বসে সে খেলা করছিল। এমন সময় গটগট আওয়াজ তুলে ইসরায়েলি কিছু সৈন্য তাদের বাড়িতে প্রবেশ করল। আহেদের ভাইয়ের নাম মুহাম্মদ। মুহাম্মদকে গ্রেপ্তার করতে এসেছে তারা। আহেদ দেখামাত্রই হাতের খেলনাসামগ্রী দ্বারা ঢিল ছুড়তে শুরু করল তাদের লক্ষ্য করে।

Scanned by CamScanner

ওরা যখন মুহাম্মদকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছিল, আহেদ চিৎকার করে প্রতিবাদ করছিল, 'এ ভূমি তোমাদের নয়, তোমরা বের হয়ে যাও এ ভূখণ্ড থেকে। আমার ভাইয়াকে বন্দী করার কোনো অধিকার নেই তোমাদের। ছেড়ে দাও আমার ভাইয়াকে। তোমরা দখলদার। তোমরা জালেম। আমাদের ওপর তোমরা জুলুম করছ...!'

আহেদের প্রতিবাদী এ সাহসিকতার জন্য বিশ্ব মিডিয়ায় তখন বেশ ঝড় উঠেছিল।

ফিলিস্তিনের রামাল্লা শহরের অদূরে নবি সালেহ গ্রামে আহেদের জন্ম ২০০১ সালে। তার পুরো পরিবারই ফিলিস্তিনি মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

পরিবারের প্রায় সব সদস্যই ইসরায়েলি সন্ত্রাসী সৈন্যদের হাতে জুলুম নির্যাতন আর নিগ্রহের শিকার হয়েছে। ইসরায়েলিদের প্রতি ঘৃণা, ফিলিস্তিনি মুক্তিসংগ্রামের জন্য নিজের সবকিছু বিসর্জন দেওয়া—এসব যেন আহেদের রক্তের সঙ্গে মেশানো।

আহেদের বাবা বাসেম তামিমি রামাল্লার বিরজেইত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক এবং বার্সেলোনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর করেন আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ে। ছাত্র থাকাবস্থায়ই বাসেম মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন।

১৯৮৮ সালে ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধ আন্দোলন প্রথম ইন্তিফাদা চলাকালে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় ইসরায়েলি সেনারা। সীমাহীন নির্যাতন ভোগ করে ভাগ্যের ফেরে মুক্তিলাভ করেন তিনি। কিন্তু ১৯৯৩ সালে আবারও বন্দী করা হয় তাঁকে। কিছুদিন পর আবারও মুক্তিলাভ করেন।

এভাবে কিছুদিন অন্তর অন্তর মোট নয়বার ইসরায়েলি কারাগারে বন্দী থাকেন বাসেম। ইসরায়েলি সৈন্যদের বর্বরোচিত নির্যাতনে তাঁর শরীরের এক পাশ অবশ হয়ে যায়। এখন এক হাত ও এক পা সম্পূর্ণ অচল।

আহেদের ফুপুও ছিলেন আরেক বীরাঙ্গনা। আহেদের ফুপাতো ভাইকে ইসরায়েলিরা গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছিল। সে ১৯৯৩ সালের কথা। গ্রেপ্তারের পর আদালতে তোলা হয় তাঁকে বিচারের জন্য।

Scanned by CamScanner

ইসরায়েলি আদালত। ইসরায়েলি বিচারব্যবস্থা। বিচার তো নয়, প্রহসন। আদালতে ওঠানোর পর নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে একের পর এক অভিযোগ তুলে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হচ্ছিল।

আহেদের ফুপু আদালতে উপস্থিত ছিলেন। ছেলের ওপর এমন একপক্ষীয় বিচারের প্রতিবাদ করেন তিনি। বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন বিচারকের সঙ্গে। এমন সময় ইসরায়েলি এক মহিলা সৈনিক এসে তাঁকে আঘাত করে। আহেদের নিরস্ত্র ফুপু তখন প্রতিশোধের নেশায় উন্মাতাল। পরিণতির কোনো পরোয়া না করে নিজের মুষ্টিবদ্ধ হাত দিয়ে প্রচণ্ড একটা ঘুষি বসিয়ে দিলেন ইসরায়েলি নারী সৈনিকটির নাকে। ব্যস, পরিণতি যা ঘটার তা-ই ঘটল।

আহেদের ফুপুকে তৎক্ষণাৎ গুলি চালিয়ে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হলো। ছেলের ওপর অবিচারের প্রতিবাদ করে আহেদের ফুপু চিরদিনের জন্য নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। নিথর দেহ তাঁর পড়ে রইল ইসরায়েলিদের আদালত নামের প্রহসনালয়ে।

আহেদের চাচা এবং মামাও স্বাধীন ফিলিস্তিনের জন্য জীবন দিয়েছেন। ৮৮-এর ইন্তিফাদায় ইসরায়েলিদের ছোড়া গুলির আঘাতে তাঁরা শহীদ হন।

আহেদের নানা-নানি ছিলেন ফিলিস্তিনে ইহুদিদের অবৈধ বসতি স্থাপন ও দেয়াল নির্মাণ প্রতিরোধ আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী।

ইসরায়েলিদের অপরাধের চিত্র এবং প্রমাণ সংগ্রহ করে বিশ্ব মিডিয়ায় প্রচারের জন্য আহেদের বাড়িতে একটা প্রেস প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রেসটি তামিমি প্রেস নামে বিখ্যাত।

আহেদের মা নারিমাল তামিমির জন্ম সৌদি আরবে, ১৯৭৭ সালে। পরিবারের সঙ্গে শৈশবেই চলে আসেন আপন মাতৃভূমি ফিলিস্তিনে। রামাল্লার এক স্কুলে মাধ্যমিক পাস করেন। তারপর বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয় তাঁকে।

নারিমালও সেই শৈশব থেকে ইসরায়েলিদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। বিয়ের পর স্বামীর পরামর্শে তিনি ইসরায়েলিদের নির্যাতন ও অপরাধের প্রমাণ সংগ্রহের জন্য চিত্রগ্রাহকের কাজ শুরু করেন। এ জন্য মোট পাঁচবার তাঁকে ইসরায়েলের জিন্দানখানায় বন্দী হতে হয়।

Scanned by CamScanner

নিজেদের গ্রাম নবি সালেহে একবার ইসরায়েলি হানাদারেরা তাণ্ডব চালাচ্ছিল। নারিমাল তাদের এই ধ্বংসযজ্ঞের ছবি ক্যামেরাবন্দী করছিলেন। এমন সময় কয়েকজন সৈন্য এসে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেড়ে নেয় ক্যামেরা। নারিমাল মারাত্মক আহত হন।

২০১২ সাল।

নবি সালেহ গ্রামে ইহুদিরা অবৈধভাবে বসতি স্থাপন শুরু করেছে। গ্রামবাসী এর প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করেছে। মায়ের সঙ্গে আহেদও শরিক হয়েছে শোভাযাত্রায়। গ্রামের গলিপথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল তারা। হঠাৎ গুলি আর গ্রেনেডের আওয়াজে প্রকম্পিত হয়ে উঠল চারদিক। ইসরায়েলিরা হামলা চালিয়েছে।

নিরস্ত্র মানুষের ওপর উন্মত্তের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল ইহুদিরা। শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আহত ব্যক্তিদের আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠল নবি সালেহের আকাশ-বাতাস।

আহেদ ও তার মাও মারাত্মক আহত হয়েছেন। আহেদের চোখে-মুখে রক্ত লেগে আছে।

কিন্তু সে নিঃশঙ্ক। প্রতিবাদের অগ্নিলাভা যেন ঠিকরে বেরোচ্ছে তার চোখ থেকে। ইসরায়েলি সৈন্যদের সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়ল বাগ্‌বিতণ্ডায়।

আহেদ আবারও বিশ্ব মিডিয়ার শিরোনামে উঠে এল। ফিলিস্তিনি সামান্য এক কিশোরী, অথচ অস্ত্রের মুখে দাঁড়িয়েও কেমন বীরাঙ্গনার মতো হুংকার দিচ্ছে—পুরো বিশ্ব অবাক! এত সাহস কোথা থেকে পায় ফিলিস্তিনের এসব কিশোর-কিশোরী?

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট, তখনকার প্রধানমন্ত্রী, রজব তাইয়েব এরদোয়ান আহেদের এ সাহসিকতার জন্য তাকে 'সাহসিকা হানজালা' পুরস্কারে ভূষিত করেন। স্ত্রী এমিলি এরদোয়ানও হানজালাকে তাঁর সঙ্গে তুরস্কে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানান।

ইহুদি ইসরায়েলিরা বুকে আগুন পোষা এ কিশোরীকে গ্রেপ্তারের জন্য ২০ বারেরও বেশি অভিযান চালিয়েছে। প্রতিবারই ব্যর্থ হয়ে তাদের ফিরে যেতে হয়েছে। আহেদ নানা কৌশলে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়েছে।

২০১৭-এর ডিসেম্বর।

Scanned by CamScanner

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী মেনে আমেরিকার দূতাবাস সেখানে স্থানান্তর করার ঘোষণা দিলেন। বিক্ষোভে ফেটে পড়ল ফিলিস্তিনিরা। প্রতিবাদী মিছিল-স্লোগানে প্রকম্পিত হয়ে উঠল পুরো ফিলিস্তিন।

নিরস্ত্র এ প্রতিবাদী মানুষগুলোকে থামিয়ে দিতে ইসরায়েল তার নির্লজ্জ রীতিমাফিক সামরিক হামলা চালায়। কিন্তু পিঠ যাদের দেয়ালে ঠেকে গেছে, তাদের আর অস্ত্রের ভয় কিসের?

আহেদও সক্রিয় ছিল এসব প্রতিবাদ-প্রতিরোধে। সে এখন বিরা এলাকার একটি স্কুলের মাধ্যমিকের ছাত্রী।

১৫ ডিসেম্বর ২০১৭।

সকালবেলা। ইসরায়েলি কিছু সৈন্য এসে আহেদের বাড়িতে উপস্থিত। আহেদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়ে এসেছে তারা। বাড়িতে প্রবেশ করেই প্রথমে বাড়ির সব কম্পিউটার ও মুঠোফোন ছিনিয়ে নিয়েছে।

আহেদ বাড়িতেই ছিল। তাকে তারা হাতকড়া পরানোর চেষ্টা করল। কিন্তু আহেদ কি এত সহজে বশে আসার পাত্রী? সে তো 'সাহসিকা হানজালা'! যে দুজন সৈন্য তাকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করছিল, দুজনের গালে কষে দুটো থাপ্পড় বসিয়ে দিল।

কিন্তু প্রশিক্ষিত সশস্ত্র সৈনিকের মোকাবিলায় নিরস্ত্র অবলা এক তরুণী কীভাবে পেরে উঠবে? সৈন্যরা তার গায়ে পরপর তিনটি বুলেট বিদ্ধ করল। জোর করে ধরে নিয়ে গাড়িতে ওঠাল। ধস্তাধস্তিতে তার একটি হাত ভেঙে যায়। ভাঙা হাত, গুলিবিদ্ধ শরীর—ওসবের প্রতি আহেদের কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। সে সমানতালে চিৎকার করে প্রতিবাদ করছিল আর সৈন্যদের প্রতি ছুড়ছিল প্রচণ্ড ঘৃণা আর ক্ষোভের বাক্যবাণ।

অবশেষে সৈন্যরা তাকে গ্রেপ্তার করে উঠিয়ে নিয়ে যায় তার বাড়ি থেকে। অসীম সাহসিনী ফিলিস্তিনি এ তরুণীর ভাগ্যে কী ঘটছে, কেউই বলতে পারে না!

Scanned by CamScanner

দ্রোহের দীপশিখা

২০০০ সালের অক্টোবর।

ফিলিস্তিনিদের প্রতিরোধ আন্দোলন ইন্তিফাদার দ্বিতীয় পর্ব তখন তুঙ্গে। প্রতিবাদে-প্রতিরোধে উত্তাল ফিলিস্তিন। সশস্ত্র ইসরায়েলিদের ট্যাংক-কামানের বিপরীতে ফিলিস্তিনিরা দাঁড়িয়ে আছে প্রতিবাদী প্ল্যাকার্ড উঁচিয়ে : 'এই ভূমি আমাদের, তোমরা দখলদার! বের হও আমাদের মাতৃভূমি থেকে!'

ইন্তিফাদায় সবচেয়ে সক্রিয় এবং তৎপর ফিলিস্তিনি কিশোর-কিশোরীরা। ইসরায়েলি সৈন্য কিংবা ট্যাংক দেখলেই তারা গুলি ছোড়ে। না, এই গুলি কোনো পিস্তল থেকে বেরোয় না। হাতই তাদের পিস্তল। হাত দিয়ে ছোড়ে। আর গুলিগুলো পাথরের। না, গুলিগুলো পাথরের নয়, পাথরগুলোই গুলি। ফিলিস্তিনের রাস্তায় পড়ে থাকা পাথর।

পাথর দিয়ে কামানের মোকাবিলা! হাস্যকর?

আমাদের চোখে হয়তো হাস্যকর, কিন্তু দেয়ালে যাদের পিঠ ঠেকে গেছে, তাদের জন্য এ পাথরই হাজার কামানের চেয়ে দামি।

১৪-১৫ বছরের কিশোর-কিশোরী। চোখেমুখে ভয়ের চিহ্নমাত্রও নেই। তারা দাঁড়িয়ে যায় ইসরায়েলি ট্যাংক-কামানের মুখোমুখি। হাতে পাথর। ছুড়ে মারছে ট্যাংক কিংবা সৈন্যদের লক্ষ্য করে। পাথর তো নয়, যেন ঘৃণার অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করছে।

সেদিন অক্টোবরের ২৯ তারিখ। ১৪ বছরের এক কিশোরের রুদ্র মূর্তি ধরা পড়ল অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের (এপি) ফটোসাংবাদিক লরেন্ট

Scanned by CamScanner

রিবরসের ক্যামেরায়। ইসরায়েলি একটি ট্যাংকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে কিশোরটি। ট্যাংক লক্ষ্য করে পাথর ছুড়ছে। ঘৃণা আর প্রতিশোধের আগুন ঠিকরে পড়ছে তার চেহারা থেকে।

পরদিন বিশ্ব মিডিয়ায় উঠে এল কিশোরটির সেই ছবি আর সাহসগাথা।

নাম তার ফারিস উদেহ।

গাজা সিটির জায়তুন শহরে মা-বাবা আর আট ভাইবোন নিয়ে ফারিসের বসবাস। ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে তার জন্ম। জন্মের পর থেকে সে শুনে আসছে গ্রেনেড বোমা আর বুলেটের ভয়ংকর শব্দ। একটু যখন বড় হয়েছে, দেখেছে রাস্তায় রাস্তায় প্ল্যাকার্ড উঁচিয়ে তার আত্মীয়স্বজন পড়শি-প্রতিবেশী মিছিল করে বেড়ায় রোজ রোজ। আর ঘৃণামিশ্রিত একটি শব্দ কানে বাজে তার—ইসরায়েল।

ফারিস শুনতে পায় দৃপ্ত কণ্ঠের সম্মিলিত স্লোগান—ইসরায়েলিরা নিপাত যাক।

কেন নিপাত যাবে ইসরায়েলিরা?

এই প্রশ্ন তার অবুঝ মনে উদয় হওয়ার আগেই সে ইসরায়েলিদের জুলুম-নির্যাতন আর নিষ্পেষণ চোখের সামনেই দেখতে পায়। এরা নিপাত যাবে না তো যাবে কে!

খুব ছটফটে আর ডানপিটে স্বভাবের ছেলে ফারিস। দিনমান ছোটাছুটি আর দুষ্টুমি। সাহসীও প্রচণ্ড। একবার দুষ্টুমির ছলে এক বিল্ডিং থেকে আট ফুট দূরত্বের আরেকটি বিল্ডিংয়ে লাফ দিয়ে চলে গিয়েছিল, কিচ্ছুটি হয়নি। অবশ্য এ জন্য পরে মা-বাবার অনেক বকা শুনতে হয়েছিল তাকে।

ছেলেকে নিয়ে প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন থাকতেন ফারিসের মা-বাবা।

ইন্তিফাদার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছিল ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে। ফারিস রোজ বাড়ি থেকে বের হয় স্কুলের উদ্দেশে। মা-বাবা তো জানেন, ছেলে স্কুলে যাচ্ছে। পড়াশোনা করছে।

একদিন স্কুলের প্রধান শিক্ষক এসে উপস্থিত ফারিসের বাসায়।

ফারিসের মা-বাবা উদ্বিগ্ন। প্রধান শিক্ষক তো এই অসময়ে তাদের বাসায় আসার কথা নয়! কী ব্যাপার?

Scanned by CamScanner

ফারিস আজ মাসখানেক ধরে স্কুলে অনুপস্থিত। প্রধান শিক্ষক নালিশ করলেন।

ফারিসের মা-বাবা শুনে অবাক। ছেলে তো রোজই স্কুলড্রেস পরে ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে বাসা থেকে বেরোয়। যায় কোথায় তাহলে?

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, স্কুলে যাওয়ার পথে প্রতিদিন সে ইন্তিফাদায় জড়িয়ে পড়ে। আরও অনেক কিশোর-কিশোরী আছে। সবাই মিলে ইসরায়েলি ট্যাংক-কামান আর সৈন্যদের লক্ষ্য করে পাথর ছুড়ে এবং স্লোগান দেয়।

বাবা খুব শাসালেন সেদিন ফারিসকে। শাসাবেন না তো কী? ইসরায়েলি সেনারা যেকোনো সময় গুলি করে মেরে ফেলতে পারে। মারছেও অনেককে।

কে শুনে কার কথা! বাবার তর্জন-গর্জন ফারিসের এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে গেল। পরদিন স্কুলের সময় ভদ্র ছেলেটির মতো সে বের হলো বাসা থেকে। মা-বাবা ভাবলেন, আজ আর ওসবে জড়াবে না। সোজা স্কুলেই যাবে। কিন্তু বিকেলে খবর পেলেন, ফারিস আজও স্কুলে অনুপস্থিত।

বাবা এবার সিদ্ধান্ত নিলেন, কড়া শাসন করতে হবে। নইলে ছেলেকে হয়তো চিরদিনের জন্য হারাতে হতে পারে।

ইন্তিফাদার বিরোধী ছিলেন না তিনি। তিনি নিজেও নিয়মিত শরিক হতেন মিছিলে। কিন্তু স্কুল ফাঁকি দিয়ে এভাবে আন্দোলনে জড়ানো তাঁর পছন্দ ছিল না। তা ছাড়া ছেলের বয়সই-বা আর কতটুকু। ঝোঁকের বশে কখন কী করে ফেলে, কোনো ঠিক আছে!

ফারিসকে বিকেলে রশি দিয়ে বেঁধে ছাদে রাখা হলো, যেন লুকিয়ে-ছাপিয়েও আর ইন্তিফাদায় যেতে না পারে। ছাদের চিলেকোঠায় সে বন্দী। ওখানেই খাবারদাবার সবকিছু। মা-বাবা ভাবলেন, দু-এক দিন ওভাবে কড়া শাসনের ভেতর রাখলে ঝোঁকটা কমে যাবে।

কিন্তু পরদিন সকালে চিলেকোঠায় গিয়ে দেখা গেল ফারিস নেই। রশির বাঁধন খুলে কীভাবে যেন পালিয়ে গেছে। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, সে আন্দোলনের সম্মুখভাগে প্ল্যাকার্ড উঁচিয়ে মিছিল করছে।

Scanned by CamScanner

মা-বাবা হাল ছেড়ে দিলেন। আন্দোলনমুখী জ্বালাময়ী এই ছেলেকে কোনোভাবেই যে দমানো সম্ভব নয়, তাঁরা বুঝতে পারছেন। ছেলের জন্য গর্বে তাঁদের বুকটা ফুলে উঠল, আবার শঙ্কাও আছে ভেতরে ভেতরে।

মা বোঝালেন, 'বেটা, ইন্তিফাদায় শামিল হও ঠিক আছে, এতে আর আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু মিছিলের একদম সম্মুখভাগে কেন যাও? ইসরায়েলিরা যেকোনো সময় গুলি করে। একটু ভেতর দিকে থাকলেই তো পারো। নিজের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তবেই না আন্দোলন। এই অল্প বয়সে যদি তোমার কিছু হয়, তবে আগামী দিনের লড়াইটা কে চালিয়ে যাবে?'

মায়ের কথা ফারিস কানভরে শুনে। এমন ভান করে, যেন মায়ের কথাগুলো সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। কিন্তু পরদিন দেখা যায়, আগের মতোই মিছিলের অগ্রভাগে প্ল্যাকার্ড উঁচিয়ে স্লোগান দিচ্ছে সে।

ফারিস স্কুল পালিয়ে যখন ইন্তিফাদায় শরিক হতো, তখন মিডিয়াকর্মীদের ক্যামেরার আড়ালে থাকার চেষ্টা করত। পাছে টেলিভিশনের খবরে তার বাবা না আবার তাকে দেখে ফেলেন, এই ভয়ে।

সংবাদ সংস্থা এপির শিরোনাম হয়ে ফারিস যেদিন মিডিয়ায় উঠে এল, তারপর কী হলো?

ইসরায়েলি ট্যাংক কি সেদিনই তাকে মেরে ফেলেছিল?

না, সেদিন কিছুই করেনি। ফারিসকে নির্বিঘ্নে পাথর ছুড়তে দিয়েছে। তবে তার মুখটি ভালোভাবে চিনে রেখেছে সৈন্যরা।

সেদিন হত্যা করলে সরাসরি মিডিয়ার চোখে পড়ে কিছুটা তুলকালাম হওয়ার আশঙ্কা ছিল। নিরীহ, প্রতিবাদী এক কিশোরকে হত্যার জন্য হইচই শুরু হতো। খামোখা হইচই ফেলার কোনো ইচ্ছে বোধ হয় সেদিন তাদের ছিল না।

পাথর হাতে প্রতিবাদী অবস্থায় হত্যার চেয়ে 'আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালাতে হয়েছে' বলে একটা অজুহাত দেখিয়ে হত্যা করাটা হয়তো

Scanned by CamScanner

ইসরায়েলিদের জন্য নিরাপদ ছিল। ফারিসকে তাই এর ঠিক ১০ দিন পর ২০০০ সালের ৮ নভেম্বর গুলি করে শহীদ করা হয়।

চঞ্চল-চপল ফারিস উদেহের জীবনপ্রদীপ ইসরায়েল চিরদিনের জন্য নিভিয়ে দিতে পেরেছে ঠিক, কিন্তু যে দ্রোহের দীপশিখায় সে ফুঁ দিয়ে গেছে, তা কি কখনো নেভাতে পারবে?

পারবে না। বরং এই শিখাই একদিন দাবানলে রূপ নিয়ে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করবে অভিশপ্ত ইহুদিদের অবৈধ আবাসন।

Scanned by CamScanner

বেথলেহেমের দিনরাত্রি

ফিলিস্তিনের বেথলেহেম শহর। জুদাইয়ান মরুভূমির প্রান্ত ঘেঁষে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়গুলো নিয়ে শহরের বিস্তৃতি। পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথে দু-একটা গাড়ির ইতস্তত ছুটে চলা, বাসিন্দাদের সন্ত্রস্ত পায়চারি—এটাই এখানকার নিত্যদিনের চিত্র।

রাস্তা-ঘাট দিনমান অনেকটা ফাঁকাই থাকে। লোকজন একান্ত প্রয়োজন ছাড়া খুব একটা বের হয় না বাড়ির বাইরে। সারাক্ষণ অজানা এক ভীতি কাজ করে সবার ভেতর, এই বুঝি ইসরায়েলি সৈন্যরা ঢুকে পড়ল শহরে!

এ যেন আতঙ্কের নগরী।

তারপরও এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা থেমে নেই। অজানা আতঙ্ক মাথায় নিয়েও তাদের ছুটে চলতে হয় জীবনের তাগিদে।

বেথলেহেমের বিখ্যাত একটি স্থান ম্যাঙ্গার স্কয়ার। ম্যাঙ্গার স্কয়ারের পাশেই একটি রেস্তোরাঁ। আল-আমাল রেস্তোরাঁ। বেশ পুরোনো ও প্রসিদ্ধ। রেস্তোরাঁতে প্রবেশ করলেই নানা স্থানে একটি বালকের ছবি সবার নজর কাড়ে। হালকা নীল রঙের পলো শার্ট পরা ঝাঁকড়া চুলের বালক। ওটা তার স্কুলের ইউনিফর্ম।

ছেলেটির নাম মুহাম্মদ শাওরিয়া। আল-আমাল রেস্তোরাঁর মালিক ওমর শাওরিয়ার ছেলে। ১৩ বছরের উচ্ছল কিশোর। পড়াশোনা আর খেলাধুলায় কাটত তার দিনরাত্রি।

Scanned by CamScanner

আরেকটি কাজও করত। ইসরায়েলি সৈন্যদের দেখলেই একরাশ ঘৃণা নিয়ে ইটপাটকেল কিংবা নুড়িপাথর—হাতের কাছে যা পেত ছুড়ে মারত।

২০১৬ সালের একদিন।

বিকেলবেলা। দিনান্তের সূর্যটা তখন পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছে। ম্যাঙ্গার স্কয়ারে হঠাৎ দেখা গেল কিছু ইসরায়েলি সৈন্য টহল দিচ্ছে। কাকে যেন খুঁজছে তারা। খুঁজতে গিয়ে পথচারীদের হয়রান করছে। অযথা জিজ্ঞাসাবাদ আর তল্লাশি।

লোকজন খেপে গেল সৈন্যদের এমন হঠকারিতায়। আশপাশ থেকে সবাই জড়ো হতে লাগল। কিছুক্ষণের ভেতর এই জটলা রূপ নিল মিছিলে।

বিক্ষুব্ধ মানুষের মুহুর্মুহু স্লোগানে ম্যাঙ্গার স্কয়ার তখন উত্তপ্ত।

কিশোর মুহাম্মদ শাওরিয়া বিকেলবেলা এসেছিল বাবার রেস্তোরাঁয়। চুল বড় হয়েছে, সেলুনে কাটাতে হবে। বাবার কাছ থেকে চুল কাটার টাকা নিতে এসেছিল সে।

'ইসরায়েল নিপাত যাক...' বিক্ষুব্ধ মানুষের স্লোগানের ধ্বনি কানে আসতেই মুহাম্মদ দৌড়ে বের হলো রেস্তোরাঁ থেকে।

তাকে আর পায় কে!

মিছিলের অগ্রভাগে সে স্লোগান দিচ্ছে গলার সবটুকু জোর দিয়ে। আর পাথর ছুড়ছে।

ইসরায়েলি সৈন্যরা এসেছিল একটি জিপ নিয়ে। সংখ্যায় ডজনখানেক। ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সবাই। ম্যাঙ্গার স্কয়ারেই দাঁড়ানো ছিল জিপটা। জিপের ভেতর সবাই সতর্ক হয়ে বসে আছে।

প্রতিবাদী মানুষের জটলাটা ভালো করে জমার অপেক্ষা করছিল তারা। যখন দেখল লোকজন জমে গেছে, অমনি গুলিবর্ষণ শুরু। বিক্ষুব্ধ জনতাকে লক্ষ্য করে নির্বিচারে গুলি করে ইসরায়েলি সৈন্যগুলো।

গুলির আওয়াজ কানে যেতেই আল-আমাল রেস্তোরাঁর মালিক ওমর শাওরিয়া দৌড়ে বেরিয়ে এলেন রেস্তোরাঁ থেকে। ছেলে কোথায় গেল, তিনি হন্তদন্ত হয়ে খুঁজছেন।

Scanned by CamScanner

মিছিলের অগ্রভাগে থাকার কারণে সরাসরি গুলির শিকার হয়েছে মুহাম্মদ। পেটে গুলি লেগেছে। ফুসফুস ফুটো করে বেরিয়ে গেছে গুলি।

ওমর এসে দেখলেন ছেলের রক্তাক্ত শরীর মাটিতে পড়ে আছে। নিস্তেজ। হৃৎপিণ্ড কেবল একটু ওঠানামা করছে।

ছেলেকে পাঁজাকোলো করে নিয়ে ওমর দিশাহারার মতো ছুটলেন নিকটবর্তী হাসপাতালে।

ততক্ষণে মুহাম্মদের প্রাণবায়ু উড়ে গেছে আকাশওয়ালার দপ্তরে।

হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তার নিরস মুখে বললেন, 'দুঃখিত।'

এসেছিল বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে চুল কাটাতে, চুল কাটানো হলো না আর, ঝাঁকড়া চুলেই তাকে নাম লেখাতে হয়েছে শহীদের তালিকায়। অথচ এখন ছিল তার হেসেখেলে স্কুলে যাওয়ার বয়স! ইসরায়েলিদের নির্মম নিষ্ঠুরতায় এ বয়সেই তাকে পাড়ি জমাতে হলো পরপারে।

মুহাম্মাদ যে জায়গাটায় গুলিবিদ্ধ হয়েছিল, বেথলেহেমের মুক্তিপাগল মানুষ অল্পদিনের ভেতর সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করেছেন। শহীদ মুহাম্মদ শাওরিয়া স্মৃতিস্তম্ভ।

বেথলেহেমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় হলো, নবি ইসা আলায়হিস সালাম এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন। আল-কুদস শহর থেকে এর দূরত্ব মাত্র ছয় কিলোমিটার। কিন্তু আল-কুদসের সঙ্গে বেথলেহেমের মানুষ খুব সহজে যোগাযোগ করতে পারে না।

তিনতলা সমান উঁচু কাঁটাতারে ঘেরা দুর্ভেদ্য দেয়ালে বেষ্টিত বেথলেহেম শহরটির অধিবাসীরা কার্যত বন্দী হয়েই জীবনযাপন করছে। ইচ্ছে করলেই তারা এই শহরের বাইরে কোথাও যেতে পারে না। শহর থেকে বেরোতে গেলে অ্যাসল্ট রাইফেলধারী সৈন্যের মুখোমুখি হতে হয় তাদের।

সৈন্যরা জিজ্ঞাসাবাদের নামে একচোট বিরক্ত করে নেবে প্রথমে। তারপর যদি তাদের মর্জি হয় তবেই কেবল বাইরের দুনিয়াটা একপলক দেখার সুযোগ পাওয়া যাবে।

মুসলমান ছাড়াও খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের বসতি আছে শহরটিতে।

Scanned by CamScanner

বেথলেহেমের মোট জনসংখ্যা ১ লাখ ৮০ হাজারের মতো। খ্রিষ্টানদের সংখ্যা ২৫ হাজারের বেশি হবে না। দিন দিন এ সংখ্যা কমে আসছে। অথচ একসময় বেথলেহেমের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাসিন্দা ছিল তারা। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর বেথলেহেম ছেড়ে একে একে তারা ইউরোপ-আমেরিকায় স্থানান্তরিত হতে শুরু করে।

সে ধারা আজও অব্যাহত আছে। একসময় হয়তো খ্রিষ্টান বাসিন্দা বলতে কেউ থাকবে না বেথলেহেমে।

এখানকার মুসলমান বাসিন্দারা খ্রিষ্টানদের সম্পূর্ণ বিপরীত। মাটি কামড়ে নিজের পিতৃপুরুষের ভিটায় পড়ে আছে তারা। খ্রিষ্টানদের মতো ইউরোপ-আমেরিকা কিংবা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে স্থানান্তরিত হওয়ার সুযোগও অবশ্য নেই তাদের। থাকলে হয়তো কেউ কেউ হিজরত করত।

বরং ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর থেকে বেথলেহেমের আশপাশে বেশ কয়েকটা শরণার্থী শিবির স্থাপিত হয়েছে। ইহুদিদের দমন-পীড়নে ভিটে-মাটি হারানো অসংখ্য ফিলিস্তিনি মুসলমান আশ্রয় নিয়েছে এই শিবিরগুলোতে। বেথলেহেমে তাই সব মিলিয়ে মুসলমানের সংখ্যা এখন ৭০ হাজারের মতো। মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ।

শহরটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইহুদিরা। ৮৫ হাজারের অধিক ইহুদির বসবাস এখানে। অথচ ১৯৯৩ সালের আগেও এদের সংখ্যা ছিল হাতে গোনার মতো।

মানচিত্রে দেখা যায়, বেথলেহেমে ২২টি ইহুদি বসতি রয়েছে। সঙ্গে আছে ডজনখানেক অস্থায়ী আবাসন। ভ্রাম্যমাণ এই বসতিগুলোকে বলা হয় আউটপোস্ট। নতুন যেসব ইহুদি পুনর্বাসিত হয়ে বেথলেহেমে আসে, প্রথমে তারা এই আউটপোস্টে ওঠে। তারপর ইহুদিদের মূল বসতিতে জায়গার বন্দোবস্ত হলে সেখানে গিয়ে থিতু হয়।

ইহুদি বসতিগুলো মূল শহরে নয়, মূল শহর তো দেয়াল দ্বারা বেষ্টিত। চতুর্দিক অবশ্য বেষ্টিত নয়, এক দিক খোলা আছে। খোলা দিকটাও ইসরায়েলি সৈন্যরা সারাক্ষণ পাহারা দিয়ে রাখে।

Scanned by CamScanner

ইহুদিদের বসতিগুলো দেয়ালের বাইরে। দেয়াল নির্মাণের আগে এসব বসতির অ্যাপার্টমেন্টের কাচের দরজা-জানালাগুলো একটাও অক্ষত থাকত না। বেথলেহেমের ক্ষুব্ধ মুসলমানদের ছোড়া ইটপাটকেল কখনো গুঁড়ো করে ফেলত কাচ, কখনোবা ফাটল ধরাত। এরা, এই ইহুদিরাই তো তাদের শান্তিময় জীবনে অপমান আর অশান্তির আগুন জ্বেলে দিয়েছে।

প্রতিশোধের আগুনে পোড়া কেউ কেউ আত্মঘাতী আক্রমণ করে বসে কখনো কখনো। আত্মঘাতী আক্রমণগুলো খুবই ভয়ানক। একেকটা আক্রমণ মৃত্যুশীতল ভয় জাগিয়ে তোলে পুরো ইহুদি কমিউনিটিতে।

এই কাজটা অধিকাংশ সময় করে শরণার্থী শিবিরের বাসিন্দারা। ইসরায়েলি সেনারা তাই এদের যমের মতো ভয় পায়।

উদ্বাস্তু শিবিরের প্রতিটি ইট-পাথর পর্যন্ত ইহুদিদের ঘৃণা করে।

ইসরায়েল রাষ্ট্রের পত্তনের কালে ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হয়েছিল যেসব ফিলিস্তিনি, তারাই বংশপরম্পরায় ভীষণ এক ক্রোধ আর দীর্ঘশ্বাস বুকে চেপে টিকে আছে এসব উদ্বাস্তু শিবিরে। বাড়ি কোথায় জানতে চাইলে এরা যেসব শহরের নাম বলে, ইসরায়েল হয়তো সেসব শহর মানচিত্র থেকেকেই মুছে ফেলেছে।

এদের চোখে-মুখে লেগে আছে বাপ-দাদাদের ভিটায় ফেরার কাতর আকুতির ছাপ। কারও কারও হাতের মুষ্টি খুঁজলে হয়তো পাওয়া যাবে মরচে ধরা চাবির গোছা—ইসরায়েলের অপজন্মের আগে যেগুলো দিয়ে ঘরের তালা খুলত তাদের পূর্বপুরুষেরা।

২০০২ সালের মার্চ।

একদিন বেথলেহেমের কাছেই জেরুজালেমের একটি সিনাগগে হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটল। ১১ জন ইসরায়েলি সঙ্গে সঙ্গে শেষ। আর একজন ফিলিস্তিনি।

নিহত ফিলিস্তিনি বেথলেহেমের একটি উদ্বাস্তু শিবিরের বাসিন্দা। ১৮ বছরের টগবগে তরুণ। নাম তার মুহাম্মদ দারাঘমেহ।

জন্মের পর থেকে উদ্বাস্তু শিবিরের ঘিঞ্জি পরিবেশে বেড়ে উঠেছে সে। দেখেছে ইহুদিদের বৈষম্য আর নির্যাতন। আর ভেতরে জমিয়েছে

Scanned by CamScanner

সীমাহীন ক্ষোভের আগুন। ১৮ বছর বয়সে এসে তার সেই আগুনই একদিন দাবানলে রূপ নিল। দাবানলের লেলিহান শিখায় জ্বালিয়ে ছারখার করল একটি সিনাগগ আর ১১ জন ইহুদি। নিজেও জ্বলল।

বেথলেহেমের উদ্বাস্তু শিবিরগুলোকে এ কারণেই ইহুদিরা ভয় পায়। ভয় পায় এদের প্রতিটি পদক্ষেপকে। যুগের পর যুগ ধরে এদের ওপর ইহুদিরা যে নির্যাতন চালিয়ে আসছে, মৃত্যুকে এখন আর তারা ভয় করে না। যাদের মৃত্যুর ভয় নেই, তাদের আর পরোয়া কিসে?

Scanned by CamScanner

অকুতোভয় প্রতিবন্ধী

নাম তাঁর ইবরাহিম আবু তুরায়াহ। ফিলিস্তিনি এক প্রতিবন্ধী যুবক। দুই পায়ের কোনোটিই নেই। হুইলচেয়ারে চলাফেরা।

২০০৮ সালে ইসরায়েলের ইহুদি সেনাদের গুলির আঘাত কেড়ে নিয়েছে ইবরাহিমের পা দুটি। অপরাধ : তিনি ফিলিস্তিন-মুক্তির জন্য বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

গাজার একটি তল্লাশি চৌকিতে দখলদার ইসরায়েলের পতাকা পতপত করে উড়ছিল। ইবরাহিম সেদিন বিক্ষোভের এক ফাঁকে চৌকির দেয়াল বেয়ে উঠে পতাকাটা নামিয়ে ফেলে। ইসরায়েলের পতাকার বদলে সেখানে টানিয়ে দেয় স্বাধীন ফিলিস্তিনের পতাকা। ব্যস। এ অপরাধের শাস্তি তাঁর দুই পা গুঁড়ো করে দেওয়া।

দুই পা হারানোর আগে মাছ শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত ইবরাহিম। মা-বাবাকে নিয়ে ফিলিস্তিনের গাজা শহরে ছিল তার ছোট্ট সংসার। পরিবারে সদস্য বলতে তাঁরা এই তিনজন। ছোট্ট হলেও দারিদ্র্য ছিল ইবরাহিমের পরিবারের নিত্যসঙ্গী। অভাব-অনটন যেন সারাক্ষণ তাঁদের তাড়া করে ফিরত।

শক্ত-সামর্থ্য জোয়ান ছেলে ইবরাহিম। চাইলেই ইসরায়েলিদের যেকোনো কাজ করে ভালো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারত। কিন্তু করেনি।

ইসরায়েলিরা দখলদার। ফিলিস্তিনের চিরশত্রু। হোক অর্থের বিনিময়ে, শত্রুর কাজ সে কেন করে দেবে? ওরা তো জোর করে এসে

Scanned by CamScanner

এখানে দখলদারত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। লাখ লাখ ফিলিস্তিনিকে করেছে বাস্তুহারা। এদের কোনোভাবেই সহযোগিতা করা যাবে না।

ইবরাহিম ইসরায়েলিদের গোলামির বদলে তাই স্বাধীন পেশা মাছ শিকারকে বেছে নিয়েছিল।

ইসরায়েলিদের বিরুদ্ধে গাজায় বিক্ষোভ-প্রতিবাদ কিংবা কোনো মিছিল হলে ইবরাহিম থাকত সবার আগে। ইহুদি সেনারা ভেবেছিল এই যুবকের পা গুঁড়িয়ে দিলে বোধ হয় একে থামানো যাবে। মিছিল-মিটিংয়ে গলা ফাটিয়ে আর আমাদের গালি দিতে পারবে না।

কিন্তু দেখা গেল, পা হারানোর পরও ইবরাহিম থেমে নেই। সেই আগের মতোই সে মাথায় ফিলিস্তিনি পতাকা বেঁধে ইসরায়েলবিরোধী মিছিল-সমাবেশে অংশ নিচ্ছে। আগে আসত দুই পায়ে হেঁটে, এখন আসেন হুইলচেয়ারে চড়ে—পার্থক্য কেবল এতটুকুই।

ফিলিস্তিনিদের আন্দোলন-সংগ্রামে ইবরাহিম সর্বদা সোচ্চার ছিল। ইসরায়েলিদের প্রতি তার ঘৃণা ছিল প্রচণ্ড। সেই ছোটবেলা থেকেই তার স্বতঃস্ফূর্ত ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল আন্দোলনে।

২০০০ সালে যখন দ্বিতীয় ইন্তিফাদা শুরু হয়, ইবরাহিম ছিল দুরন্ত এক কিশোর। ইসরায়েলি ট্যাংক-কামানের সামনে বুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে যেত হাতে পাথর নিয়ে।

ইহুদিদের প্রতি তার আজন্ম ঘৃণা। পৃথিবীতে চোখ মেলার পর থেকে যে দেখে আসছে ইসরায়েলের অমানবিক আচরণ আর নির্যাতন, তার অমন ঘৃণা জন্মাবে না তো জন্মাবে কার?

পঙ্গুত্ব বরণের পর ইবরাহিম প্রচণ্ড অর্থকষ্টে ভোগে। পরিবারে সে-ই তো একমাত্র কর্মক্ষম পুরুষ। বৃদ্ধ মা-বাবার মুখে দু-টুকরো রুটি তুলে দিতে ইবরাহিম গাড়ি ধোয়ার কাজ নেয়। তবে ইহুদিদের কোনো গাড়ি নয়। কেবল স্থানীয় ফিলিস্তিনিদের গাড়ি।

মানুষের গাড়ি পরিষ্কার করে যা উপার্জন হতো, তা দিয়েই চলত তার ছোট্ট পরিবার।

২০১৭ সালের ডিসেম্বর।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দিলেন ইসরায়েলে আমেরিকার দূতাবাস তেল আবিব থেকে জেরুজালেমে স্থানান্তর করা

Scanned by CamScanner

হবে। জেরুজালেমকে তিনি ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ট্রাম্পের হঠকারিতামূলক এ ঘোষণায় বিক্ষোভে ফেটে পড়ল ফিলিস্তিনের জনগণ। ৬ ডিসেম্বর ট্রাম্পের ঘোষণা এসেছে, তার পরের দিন থেকে ফিলিস্তিনিরা রাস্তায় রাস্তায় প্রতিবাদ শুরু করে।

১৫ ডিসেম্বর শুক্রবার। জুমার পরপরই গাজা শহর উত্তাল হয়ে উঠল ফিলিস্তিনিদের প্রতিবাদ আর মৌখিক প্রতিরোধে। স্থানে স্থানে মিছিল-সমাবেশ। ইসরায়েলি সৈন্যরা ঘুরঘুর করছে তাদের আশপাশে। বিক্ষুব্ধ জনতার কেউ কেউ ইটপাটকেল ছুড়ে মারছে তাদের দিকে।

ইবরাহিমও প্রতিদিনের মতো শরিক হয়েছে একটি সমাবেশে। বন্ধুরা তাঁকে অনেক বারণ করেছিল আজকের বিক্ষোভে অন্তত না যেতে। কারণ, আজ গাজার ইসরায়েলি সৈন্যরা খুবই মারমুখী। যেকোনো সময় গুলি করতে পারে।

ইবরাহিম বন্ধুদের বারণ হাসিমুখে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি যাবেনই। হুইলচেয়ারে করে জুমা পড়লেন মসজিদে। তারপরই বিক্ষোভ শুরু। ইবরাহিম নামাজ শেষে অন্যদের সঙ্গে নেমে পড়লেন বিক্ষোভে। তাঁর মাথায় ফিলিস্তিনি পতাকা বাঁধা। হাতেও আরেকখানা পতাকা।

গাজা সিটির পূর্ব সীমান্তে বিক্ষোভ চলছিল শান্তিপূর্ণভাবে। ট্রাম্পের অন্যায্য ঘোষণার ন্যায্য প্রতিবাদ। হঠাৎ ইসরায়েলি সৈন্যরা গুলিবর্ষণ শুরু করল। শান্তিপূর্ণ মিছিল মানুষের ছোটাছুটি, আহত মানুষের চিৎকার আর আর্তনাদে রূপ নিল। ছোপ ছোপ রক্তের দাগ চারদিকে।

হুইলচেয়ারে বসা ইবরাহিমের শরীরে এসে বিদ্ধ হলো কয়েকটি গুলি। গুলিবিদ্ধ জায়গাগুলো থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। বন্ধুরা তাঁকে পাঁজাকোলো করে তৎক্ষণাৎ নিয়ে গেল হাসপাতালে। ইমার্জেন্সি বিভাগে খানিকক্ষণ থাকার পর ইবরাহিম শেষনিশ্বাস ত্যাগ করে।

প্রতিবন্ধী ইবরাহিম জীবন দিয়ে আবারও প্রমাণ করল, জোর খাটিয়ে কেউ স্বাধীনতাকামীদের দমাতে পারে না, সে যত বড় শক্তিশালীই হোক না কেন।

ইবরাহিমের বয়সের কাঁটা তখন ২৭-এর কোটায়। ২৭-এর যুবকদের চোখে কত স্বপ্নই তো জ্বলজ্বল করে। ছোট্ট একটা ঘর বাঁধার

Scanned by CamScanner

স্বপ্ন, পূর্ণিমা রাতে ঘরের ছাদে কোমল এক জোড়া হাত ধরে বসে থাকার স্বপ্ন। আরও কত কত স্বপ্ন! ইবরাহিমেরও কি এমন স্বপ্ন ছিল না? ছিল। অবশ্যই ছিল। ২০০৮-এর পর থেকে হয়তো সে স্বপ্ন ফিকে হয়ে গিয়েছিল। ফিকে করে দিয়েছিল ইসরায়েলি হানাদার সৈন্যরা। ২০১৭-তে এসে তো জীবনটাই ফিকে করে দিল।

ইবরাহিমদের অমূল্য ত্যাগ, কোরবানি আর রক্ত-পিচ্ছিল এ পথ মাড়িয়েই ফিলিস্তিনিদের জীবনাকাশে একদিন স্বাধীনতার সোনালি সূর্য উদিত হবে। মসজিদে জামিউল কিবালি আর মসজিদে কুব্বাতুস সাখরার মিনার থেকে মুয়াজ্জিনের নিঃশঙ্ক স্বাধীন কণ্ঠে ধ্বনিত হবে আল্লাহু আকবার-এর সুমধুর আওয়াজ। সেই দিনটি খুব জলদি আসুক, পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষের এটাই প্রত্যাশা।

<u>সমাপ্ত</u>

Scanned by CamScanner

আল-কুদস। জেরুজালেম। ফিলিস্তিন।

আমাদের মুসলিম মানসে অনির্বাপিত ব্যথার দীপশিখা। যুগ যুগ ধরে আমরা এ ব্যথা বয়ে বেড়াচ্ছি। প্রতিদিন এ ব্যথা থেকে রক্তপাত হচ্ছে; আমরা কাঁদছি, হাহাকার করছি, আকাশ কাঁপিয়ে আরশের মালিকের কাছে প্রার্থনা করছি—আগামী রমজানে আমরা আবার বায়তুল মুকাদ্দাসের চত্বরে বসে ইফতার করতে চাই। হে আল্লাহ! তুমি আবার আমাদের সেই সাহায্য ও শক্তি দান করো।

আল্লাহ নিশ্চয় একদিন আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করবেন। আমরা সেই দিনের প্রতীক্ষায় প্রতিদিন সইছি ব্যথার দহন।

এ গ্রন্থ সেই ব্যথাদীর্ণ ফিলিস্তিনের ইতিহাস ও বর্তমান তুলে এনেছে হৃদয়গ্রাহী বর্ণনায়।

e-store: rokomari.com/noboprokash

নবপ্রকাশ

GOLPO BOLI FILISTINER
by Hammad Ragib
Price: BDT 120.00 | US $ 04.00

ISBN 9789849347156

noboprokash.com | noboprokash@gmail.com | fb/noboprokash | 01974 888441